ড. রাগিব সারজানি

শোনো হে যুবক



লেখক পরিচিতি

ড. রাগিব সারজানি

জন্ম : ১৯৬৪ ঈ.

আল মুহাল্লা কুবরা, মিশর।

ড. রাগিব সারজানি মিশরের বিশিষ্ট ইসলাম প্রচারক, ইতিহাসবিদ ও একজন আধুনিক আরবী লেখক। পেশায় মূলত তিনি একজন চিকিৎসক। তবে চিকিৎসা পেশার পাশাপাশি ইসলামী ইতিহাসের গভীর গবেষণা বর্তমান পৃথিবীতে তাকে একজন বিশিষ্ট ইসলামী ইতিহাসবিদ হিসেবে পরিচিত করেছে। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর পবিত্র কুরআনুল কারীম হেফজ করেন। ইসলামের প্রতি আস্থা ও ভালবাসা, ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দরদ ও শ্রদ্ধা- তার চোখের তারায় যে আগামীর স্বপ্ন আঁকে- সেই স্বপ্ন বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতেই তার লেখালেখি। এই স্বপ্ন ছবি হয়ে উড়ে বেড়ায় তার রচনার ছত্রে ছত্রে।

শিক্ষা :

তিনি ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় এর মেডিসিন অনুষদ থেকে ইউরোসার্জারি বিষয়ে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেন। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে পবিত্র কুরআনুল কারীম হেফজ করেন।

কর্মক্ষেত্র :

অধ্যাপক : মেডিসিন অনুষদ, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্য : আন্তর্জাতিক মুসলিম উলামা পরিষদ।

সদস্য : মানবাধিকার শরিয়া বোর্ড

সদস্য : আমেরিকান ট্রাস্ট সোসাইটি

প্রধান : ইতিহাস বিভাগ, ইদারাতুল মারকাযিল হাযারা, মিশর।

রচনাবলি :

ইতিহাস ও ইসলামী গবেষণা বিষয়ে এ পর্যন্ত তার ৫৬টি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

কিসসাতু তাতার [তাতারীদের ইতিহাস]

কিসসাতু উন্দুলুস [স্পেনের ইতিহাস]

কিসসাতু তিউনুস [তিউনেসিয়ার ইতিহাস]

আর রাহমা ফি হায়াতির রসূল

মা'আন নাবনী খায়রা উম্মাতিন প্রভৃতি।

আমরা তাঁর সুস্থ সুন্দর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

উৎসর্গ

সম্ভাবনাময় উচ্ছল তরুণ 'আদনান কবীর' এর স্মরণে.. ও তার রূহের মাগফেরাত কামনায়।
ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থায় 'গ্যাং কালচার' এর মর্মান্তিক উদাহরণ যিনি।
এমনতো হবার কথা ছিল না। একটি পুষ্প প্রস্ফুটিত হবার আগেই অকালে ঝরে পড়ল! একটি অমিত সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল! এ দায়ভার কার? এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় বা কী? এ সকল প্রশ্নের সরল উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এ বইতে।

অনুবাদকের কথা

যুবসমাজ বিশ্ব সভ্যতার মেরুদণ্ড। পৃথিবীর ইতিহাসে যত মহান কাজ হয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই যুবসমাজের হাত ধরে হয়েছে। প্রতিটি উত্থানের নেপথ্যে যুবসমাজের যে অনস্বীকার্য অবদান তা ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। কিন্তু আফসোস, মুসলিম যুবসমাজ আজ নিজেদের সেই পরিচয় ভুলতে বসেছে। জানেনা তাদের নিজেদের অতীত ঐতিহ্য। আজ তারা নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাদের মৌলিক সমস্যাগুলো কী? ও তা থেকে উত্তরণের উপায়ই বা কী? এ সবকিছু *শোনো হে যুবক!* এ অত্যন্ত সংক্ষেপে সাবলীল ও মার্জিত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

বক্ষমাণ গ্রন্থটি ড. রাগিব সারজানি কর্তৃক রচিত رسالة إلى شباب الأمة এর অনুবাদ।

আমি পূর্ণ আস্থার সাথে বলতে পারি, যদি কেউ একবার এই বইটি পড়ে, তবে তার জীবনে অবশ্যই পরিবর্তন আসবে। জীবন গঠনমূলক অন্যান্য বইয়ের পাশাপাশি এটিও একবার পড়ে দেখুন। বইটি আকারে খুব ছোট হলেও পড়লে মনে হবে যেন হাজার পৃষ্ঠার নির্যাস এতে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের ইসলামের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যুবসমাজ যুবসাহাবায়ে কেরামের মতো হওয়ার তৌফিক দান করুন– আমীন।

আবদুল আলীম
৩০.১০.২০১৬

সূচিপত্র

ভূমিকা

আমার এক বন্ধু জ্যোৎস্নাময় এক রাতে তার ছেলে সম্পর্কে আমার কাছে অভিযোগ করলেন। ছেলের বয়স প্রায় বিশের কোঠায়।

আমাকে তিনি বললেন– আমি জানি না, তার সাথে আমি কী আচরণ করব? তাকে নিয়ে আমি খুব পেরেশান আছি!

আমি তাকে বললাম– কি বুঝাতে চাচ্ছেন? খোলাখুলি বলুন, আপনার ছেলে কী উচ্ছন্নে গেছে? সে কি নামায পড়েনা? পিতা মাতার অবাধ্য হয়েছে কি? নাকি দৃষ্টি হেফাজতে তার সমস্যা আছে? নির্দিষ্ট করে বলুন, সমস্যাটা কোথায়?

তার উত্তর শুনে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম– তিনি দরদ ভরা কণ্ঠে বললেন, ডক্টর সাহেব! বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। আমার অভিযোগ হলো, সে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে প্রচণ্ড আগ্রহী। ছোট-বড় সবকিছুতে হালাল-হারাম খুঁজে বেড়ায়। প্রায় সব ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করে। দীর্ঘ সময় সে বড় বড় বইপত্র ও গবেষণামূলক কিতাবাদি ঘাঁটাঘাঁটি করে। দিনভর সে ফিলিস্তিন, ইরাক, সুদান ও চেচনিয়া সম্পর্কে কথা বলে। (ছেলে আমার বয়সের তুলনায় অনেক কঠিন বিষয় নিয়ে ভাবছে) আমি তাকে বহুবার বলেছি, এসব ছেড়ে অন্য যুবকদের মতো প্রাণবন্ত সময় কাটাও। আমি তাকে নামায-রোযা ছাড়তে বলিনি; কিন্তু বলেছি– এগুলোর পাশাপাশি একটু খেলাধুলাও উপভোগ করো।

ডক্টর সাহেব আমাকে কি একটু সুপরামর্শ দেবেন? আমি তার সাথে কীরূপ আচরণ করবো?

আমি দীর্ঘঃশ্বাস ছেড়ে গভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললাম– এ বিষয়ে আমার পরামর্শ হলো, এ ক্ষেত্রে আপনি আপনার সন্তান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন!! কেননা, অনেক বাবার সঠিক দিক নির্দেশনা প্রয়োজন। আর বহু সন্তান তাদের উর্বর মস্তিষ্ক প্রজ্ঞা ও সঠিক চিন্তার আলোয় আলোকিত করে তোলে, যা তাদের বাবারা দীর্ঘকাল পরেও অর্জন করতে পারেন না।

আমার বন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে বারবার একই কথা বলছিলেন। আমার কথা বোঝার কোন চেষ্টাই করছিলেন না। বলছিলেন– ডক্টর সাহেব, আমার ছেলে তো এখনো যুবক। তার বয়স কেবল বিশ বছর!!

আমার বন্ধুর চেতনার আকাশে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে আমি তার এই প্রশ্নের কারণে গভীর চিন্তায় পড়ে যাই। ভাবতে থাকি– ইসলামে যুবসমাজের কী মূল্যায়ন? যুব সম্প্রদায়ের ভূমিকাই বা কী? জাতি যুবসমাজের কাছে কী প্রত্যাশা করে? আজকের মুসলিম যুবসমাজ কোন পথে ধাবমান? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন ও চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। এ সকল প্রশ্ন ও চিন্তার ফসল হলো বক্ষমাণ গ্রন্থ।

রাগিব সারজানি

যুবসমাজের সমস্যাবলী

আমি একবার কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদ সেমিনারে যোগ দিয়েছিলাম। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিলো **'যুবসমাজের সমস্যাবলী'**। আমি সেমিনারে বক্তব্য দেওয়ার পূর্বে যুবসমাজের প্রধান প্রধান সমস্যা সম্পর্কে তাদের মতামত জানার চেষ্টা করি। যাতে আমার চিন্তা-চেতনা ও ভাবনা যেন তাদের বাস্তব অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন না হয়। এমন যেন না হয়, আমি আছি এক প্রান্তে আর তারা আছে আরেক প্রান্তে। তাই আমি উপস্থিত প্রত্যেক যুবককে তাদের জীবনের প্রধান ও মূল সমস্যাবলী সংক্ষেপে চিরকুটে লিখে জানাবার আবেদন করি, যে সমস্যাগুলোর যথাযথ সমাধান তাদের সুখীমানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। উপস্থিত যুবকেরা তাদের সমস্যাবলী লিখিত আকারে জানিয়ে আমার আহ্বানে সাড়া দেয়।

আমি অবাক না হয়ে পারি না- আমি যেসব সমস্যা সম্পর্কে পূর্ব থেকে আলোচনা করার নিয়ত করেছিলাম, তা বর্তমান যুবসমাজের মূল সমস্যা নয়। বস্তুত বর্তমান যুবসমাজ এক গ্রহে বাস করে, আর আমি ভিন্ন কোনো গ্রহে। আমি হয়রান হয়ে পড়ি, সিদ্ধান্তহীনতা আমাকে ঘিরে ফেলে। কোন সমস্যাগুলোকে প্রাধান্য দেব, তারা যে সব সমস্যার কথা বলে সেগুলো? না আমি যেগুলোকে তাদের প্রধান সমস্যা মনে করেছিলাম, সেগুলো? অবশেষে আমি তাদের লিখিত সমস্যাগুলোর মাধ্যমে আমার আলোচনা শুরু করি। তাদের লিখিত সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

- বেকারত্ব। লেখাপড়া শেষে বেকার হওয়ার ভয়।
- বিয়ের আকাংঙ্খা। অথচ এ সময়ে তাদের পক্ষে সামর্থ্যহীনতার কারণে তা অসম্ভব হয়ে ওঠে।
- যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার প্রেক্ষিতে তাদের যৌনাকাঙ্ক্ষা নাড়া দিয়ে ওঠা।
- দৃষ্টি অবনমিত রাখতে না পারা।
- জটিল শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তা কাজে না লাগার অনুভূতি।
- গোপন কু-অভ্যাস।

- দরিদ্রতা ও অর্থসংকট।
- একপেশে ভালোবাসা।
- মাদকদ্রব্যের সয়লাব।
- ধূমপান।
- তাদের একজনের সমস্যা ছিল, সে মুঠোফোন ক্রয় করতে চায়; কিন্তু তার বাবা তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এই ছিল কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবসমাজ কর্তৃক পেশকৃত সমস্যাবলী। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তারা মিসরীয় যুবসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে; বরং বলা যায়, তারা মুসলিম বিশ্বের যুবসমাজের প্রতিনিধি। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তারা হলো উম্মাহর উৎকৃষ্ট যুবসমাজের নির্বাচিত অংশ। কারণ, তারা শিক্ষিত ও আলোকিত বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া যুবসমাজ। যেকোনো বিষয় সুচিন্তিত উপায়ে বাস্তবায়িত করার যোগ্যতা ও ক্ষমতা তাদের আছে। এমনকি তারা এই **'যুবসমাজের সমস্যাবলী'** শীর্ষক ইসলামী ভাবধারার সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার তীব্র অপেক্ষায় সময় পার করছিল। সুতরাং বলা যায়, তারা বিশ্ব প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যেসব সমস্যা উল্লেখ করেছে, তা বর্তমান বিশ্ব যুবসমাজের সমস্যাবলীর সার নির্যাস।

তবে তারা যে এসব সমস্যা উল্লেখ করবে আমি তা আশা করিনি। কারণ, এগুলো যুবসমাজের প্রকৃত সমস্যা নয়। এসব সমস্যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রধান হিসেবে চোখে পড়লেও এর বাইরে এমন অনেক সমস্যা রয়েছে– আমার ধারণামতে– যা আরও গুরুতর ও জটিল।

উদাহরণস্বরূপ যেসব জটিল সমস্যা তারা উল্লেখ করেনি, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশে শরিয়া আইন বাস্তবায়ন না হওয়া, মানবরচিত আইন ও নীতিমালার প্রতি আস্থাশীল হওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহ বিমুখ হওয়া।

২. অনেক মুসলিম ভূখণ্ড অমুসলিম শক্তি কর্তৃক বে-দখল হয়ে যাওয়া। বিশেষতঃ ফিলিস্তিন, ইরাক, কাশ্মীর, চেচনিয়া ও আফগানিস্তান। এসব ভূখণ্ডে মুসলমানরা অন্যায়-অবিচার, জুলুম-হত্যা ও নির্মম অত্যাচারের শিকার।

৩. মিডিয়া কর্তৃক ইসলামকে লক্ষ্য করে সাঁড়াশি আক্রমণ এবং প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম ও

আলেম-ওলামাকে গালিগালাজ ও সমালোচনা করা। প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া তথা দৈনিক পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন ও ইন্টারনেটে এই অশুভ কর্মের মহড়া আজ খুব স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪. অধিকাংশ মুসলিম দেশ আজ অপরিশোধ্য ঋণে জর্জরিত। বাহ্যত এ ঋণ থেকে বেরিয়ে আসা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

৫. প্রশাসনিক দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব, সুদ-ঘুষ, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, জালিয়াতি, আত্মসাত, মিথ্যা অপবাদ, যেসব অনৈতিক কার্যাবলি মুসলিম বিশ্বকে সভ্য ও উন্নত দেশের তালিকার একেবারে নীচের দিকে ঠাঁই দিয়েছে। শুধু একটি দেশ প্রশাসনিক নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার মানদণ্ডে শতকরা ৫৩ ভাগ উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সেই দেশটি হলো মালয়েশিয়া। আর তিউনিসিয়া হলো শতকরা ৫০ ভাগ। অন্য সকল মুসলিম দেশ আমানতদারি ও চারিত্রিক গুণাবলিতে চরম অধঃপতনের শিকার!![১] [উল্লেখ্য যে, ইসরায়েল এর মতো দেশও নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার মানদণ্ডে শতকরা ৬৮ ভাগ উন্নতি সাধন করতে পেরেছে]

৬. জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়া। কারিগারি ও সৃজনশীল শিক্ষা খাতে জাতীয় অর্থনৈতিক বাজেট কম হওয়া। আরব দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে জাতীয় অর্থনৈতিক বাজেটের ০.৬ ভাগের বেশি বরাদ্দ করা হয় না। যা খুবই নগণ্য। অন্যদিকে ইসরায়েল এ খাতে ২.৪ ভাগ বরাদ্দ করে!

৭. বিশ্বের বহু অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছা। মানবজাতির একটা বৃহদাংশ এখনো ইসলামের বাণী শোনেনি। অথবা শুনে থাকলেও মিথ্যা কিংবা বিকৃত বাণী শুনেছে। অথচ মুসলিম উম্মাহর জন্য ফরজ, ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো।

একটু ভেবে দেখুন!

যুবসমাজ কর্তৃক উল্লেখিত সমস্যাবলি ও আমি যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করলাম, যে সমস্যাগুলোর কথা যুবকদের অনুসন্ধানে বের হয়ে আসেনি, এগুলোর মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য কী?

একটু বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাবেন, এ দুইয়ের মাঝে মৌলিক পার্থক্য হলো, যুবকদের উল্লেখকৃত সমস্যাগুলো হলো ব্যক্তিগত সমস্যা। আর আমি যে

[১] বর্তমানে আরো কিছু মুসলিম দেশ অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। যেমন ব্রুনাই, কাতার, আরব আমীরাত, তুরস্ক, মরক্কো, সেনেগাল ও ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি।

সমস্যাবলির কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলো সামগ্রিক ও জাতিগত। গোটা মুসলিম সমাজ যে সমস্যায় আক্রান্ত।

এখানে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মুসলিম যুবসমাজ তাদের এক ভয়াবহ দিক উন্মোচন করেছে। তা হলো, তারা আজ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। জাতিকে নিয়ে তাদের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। সবাই শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। এটা উম্মাহর জন্য ভয়াবহ বিপদের অশনি সংকেত। কারণ, উল্লিখিত প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগ দরকার। সেখানে মূল বিষয়টি যদি যুবসমাজের মাথা থেকে দূর হয়ে যায়, তাহলে তা অবশ্যই ভাববার বিষয়!!

প্রশ্ন হলো, আজকের যুবসমাজ কেন জাতির প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো নিয়ে চিন্তিত নয়?

বস্তুতঃ আজ মুসলিম যুবসমাজ এমন কিছু মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত, যা গুরুত্বসহ দ্রুত চিকিৎসা করা বাঞ্ছনীয়। এ সকল ব্যাধির মাঝে অন্যতম ব্যাধি হলো, **'জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার না থাকা'**। যুবসমাজ আজ নিজেদের মূল্য জানে না। জানে না জীবনে তার ভূমিকা কী? জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ আজ বহু যুবকের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। এমনকি কেউ কেউ তো কেবল গাড়ি বা ফ্লাটের মালিক হওয়া এ জাতীয় বৈষয়িক বিষয়কে নিজেদের প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করে। যদিও আমি জানি এধরনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হারাম নয়। তদুপরি এ কথা স্বীকৃত যে, এগুলো জীবনের মহৎ কোনো লক্ষ্য হতে পারে না। আফসোস, মহান লক্ষ্যের কথা আজ মানুষ ভুলতে বসেছে। তুচ্ছ-নগণ্য লক্ষ্যগুলো বেশিরভাগ যুবকের কাছে আজ মহান লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এটি বড় ধ্বংসাত্মক ব্যাপার। যেন যুব সমাজ বলতে চায়–

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (المؤمنون)

> 'আমাদের জীবন তো কেবল পার্থিব (দুনিয়াবী) জীবন। (এখানেই) আমরা মরব, বাঁচব। আমরা আর পুনরুত্থিত হবো না।'[২]

আজ মুসলিম যুবসমাজ অর্থহীন বিনোদন, আমোদ-ফুর্তি, আনন্দ-উল্লাস, খাবার-দাবারের পেছনেই ব্যস্ত থাকে। অন্যকিছুতে তারা মনোযোগী হয় না।

---

[২] সূরা মুমিনুন (২৩): ৩৭

যুবসমাজের অধিকাংশই এই নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। ফলে জাতি আজ সমস্যার অথৈই সমুদ্রে ডুবু ডুবু প্রায়। আর যুবসমাজ দূর থেকে দেখছে ও মজা করছে। যেন বিষয়টি তাদের কাছে কোন গুরুত্বই রাখেনা। অথচ তারা ভালোভাবেই জানে যে, গোটা জাতির সাথে তাদের ধ্বংসও অনিবার্য। কারণ, তারা ঐ জাতিরই অংশ। এ জাতির দেশ, ধর্ম ও ভবিষ্যত তাদেরই দেশ, ধর্ম ও ভবিষ্যত।

যুবকদের অন্তরে আজ এ ধারণা বদ্ধমূল যে, তারা বয়সে এখনো অনেক ছোট; যেন এ সকল কঠিন সমস্যার সমাধান নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা তাদের উচিত নয়। তারা মনে করে, তাদের জীবনের এই সময় কেবল বিনোদন, পিকনিক, বনভোজন ইত্যাদি আনন্দদায়ক কাজে ব্যয় করার জন্য। আর সামান্য কিছু সময় পরীক্ষা, ক্লাস ও অল্প কিছু কাজে ব্যয় করতে হবে!!

যে প্রশ্নটি আমাকে দিশেহারা করে রেখেছে তা হলো, যুবসমাজ কি আসলেই ছোট? তাদের বয়স কি বাড়বে না? আর বয়সের ছোট হওয়াই কি ছোট হওয়ার মূল মাপকাঠি? নাকি প্রকৃত ছোট হওয়ার মূল মাপকাঠি হলো চিন্তা, বুদ্ধি, চরিত্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ছোট হওয়া?

ইসলামে শিশুর সংজ্ঞা মানবরচিত সংজ্ঞার চেয়ে অনেক ভিন্ন। এই ভিন্নতার কারণে বহু বিষয়ে ভিন্নতা সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ– জাতিসংঘ শিশুর সংজ্ঞা দিয়েছে– যে সন্তান আঠারো বছরে উপনীত হয়নি, তাকে শিশু বলা হবে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু হলো, যে সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি। ইসলাম প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার সময় নির্ধারণ করেছে ১৩ বা ১৪ বছর। সুতরাং শিশু এই বয়সে উপনীত হলে তাকে যুবক বলা হবে। আর তখনই তার ওপর নানা বিধান আরোপিত হবে। তখন তার কথাবার্তা, কাজকর্ম তথা সবকিছু শরিয়ত মোতাবেক হতে হবে এবং সবকিছু সম্পর্কে তাকেই জবাবদিহি করতে হবে। হয়তো তার সম্পর্কে তার পিতা-মাতা, শিক্ষক-উস্তাজ বা সমাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। কারণ, সে এখনও তাদের দৃষ্টিতে ছোট। কিন্তু কেয়ামত দিবসে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তাকে তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরের সব কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। যদিও তার বয়স এখনো ১৩, ১৪ বা ১৫ বছর। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা– যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার সক্ষমতা-পারদর্শিতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল– তাই তার প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরের সময়ের বিস্তারিত হিসাব গ্রহণ করবেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলা জানেন, এই বয়সে শিশু উপনীত হলে সে গভীরভাবে চিন্তা করতে সক্ষম হয়। ভালোভাবে কাজ করতে পারে। সততার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করতে পারে।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الملك)

'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না?
তিনি সূক্ষ্মদর্শী। সম্যক অবগত।'[৩]

বরং মানুষের বয়সের এই সময়কাল তথা ১৩/14 থেকে ১৮ বছর হলো যৌবনকাল– এই সময় সম্পর্কে কেয়ামত দিবসে বিশেষভাবে প্রশ্ন করা হবে। ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ خَمْسٍ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ ، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. (رواه الترمذي)

'কোন আদমসন্তান কেয়ামতের দিন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে থেকে এক কদম সরতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ না করবেন। যথা :

১. তোমার জীবন তুমি কীভাবে কাটিয়েছ?
২. যৌবন কীভাবে কাটিয়েছ?
৩. সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছ?
৪. সম্পদ কোথায় ব্যয় করেছ?
৫. আর যা জেনেছ সে অনুযায়ী কী আমল করেছ?'[৪]

এই হাদীসে যৌবনকালের মূল্য ও গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। যৌবনকাল যদিও জীবনের একটি সীমিত সময়ের নাম, তবুও আল্লাহ তা'আলা এই সময়কে কেন্দ্র করে কেয়ামতের দিন নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন করবেন। যদি হাদীসে কেবল জীবনের কথা উল্লেখ করা হতো, তবু অর্থ পূর্ণতা পেত। কারণ, যৌবন তো জীবনেরই অংশ। তারপরও পৃথকভাবে যৌবনের কথা উল্লেখ করে এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, মানবজীবনে এ সময়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। যেমন যুবক তুলনামূলকভাবে বয়সে ছোট হলেও কেয়ামত দিবসে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তার হিসাব নেওয়া হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত সে জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলোর উত্তর দিতে না পারবে, ততক্ষণ সে পুলসিরাত পার হতে পারবে না এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সেই বিশেষ মুহূর্তগুলোর অন্যতম হলো যৌবনকাল।

---

[৩] সূরা মুলক (৬৭) : ১৪
[৪] *তিরমিযী* : ২৩৫৩

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আদী ইবনে হাতেম রা. সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. (متفق عليه)

'কেয়ামত-দিবসে প্রত্যেকের সাথে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কথা বলবেন। মাঝে কোনো দোভাষী থাকবে না। বান্দা ডানে তাকালে কেবল নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। বামে তাকালে কেবল নিজের কৃতকর্ম দেখতে পাবে। সামনে তাকালে কেবল জাহান্নামের আগুন দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও।'[৫]

উক্ত হাদীসে এ কথা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, কেয়ামতের দিন কেউ প্রশ্ন থেকে মুক্তি পাবে না। বয়স-জাতি-রঙ-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সেদিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, যৌবনকালকে অর্থহীন বিনোদন, আনন্দ-ফুর্তি ও দায়িত্বহীনতায় কাটানো বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার পরিপন্থী। বিবেকের দাবি হলো, যৌবনকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানো। কারণ, যৌবন কোথায় ব্যয় হয়েছে, এ সম্পর্কে অবশ্যই প্রত্যেকে জিজ্ঞাসিত হবে।

মোটকথা আল্লাহ তা'আলা– যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং বিধানাবলি আরোপ করেছেন– প্রত্যেক যুবকের মাঝে এমন সব যোগ্যতা দান করেছেন, যার মাধ্যমে তারা তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম হয়। এর আলোকে বলা যায়, আল্লাহর তৌফিকে যুবসমাজ জাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পূর্ণ সক্ষম।

মুসলিম জাতির যুবসমাজের জন্য এটা কোনো নতুন বিধান নয়; পৃথিবীতে বহু জাতির ভাগ্য ও ইতিহাস যুবসমাজের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যেন এ জাতির যুবসমাজকে কল্যাণ ও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেন।

---

৫ বুখারী : ৬৯৮১

ইসলামে যৌবনকালের মর্যাদা ও গুরুত্ব

ইসলামধর্মে যৌবনকালের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন, মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে যত বড় বড় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা তৎকালীন যুবসমাজের হাতেই হয়েছে। এটি কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটি পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থাপনা, যা বারংবার পুনরাবৃত্ত হয়।

চলুন একটু ইসলামী ইতিহাসের দিকে তাকাই...

ওহী নাজিলের শুরুরদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন?

কাদের ইসলামের অনুসারী বানানো হয়েছিল?

ইসলামের আমানত কাদের প্রতি ন্যস্ত করা হয়েছিল?

গোটা মক্কা নগরীর জীবন যাত্রা পরিবর্তনের দায়িত্ব কাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল?

গোটা বিশ্ববাসীর জীবন পরিবর্তনের দায়িত্ব শুধু তৎকালের জন্য নয়, বরং কেয়ামত পর্যন্ত কাদেরকে দেওয়া হয়েছিল?

কারা ইসলামের অগ্রগামী দল? কারা ইসলামের অগ্রগামী সৈনিক?

কারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম? যাদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. (متفق عليه)

> 'সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষেরা। এরপর পরবর্তী যুগের মানুষেরা। তারপর পরবর্তী যুগের মানুষেরা।'[৬]

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

কারা মক্কার কাফের মুশরিকদের মোকাবেলা করেছিল?

কারা আরব উপদ্বীপের মূর্তির পূজার বিরোধিতা করেছিল?

---

[৬] বুখারী : ২৬৫২

কারা রোম-পারস্যের দুর্গগুলোকে ভেঙে খানখান করে দিয়েছিল?
কারা কিসরা-কায়সারের (খসরু-সীজার) প্রাসাদে কম্পন সৃষ্টি করেছিল?
কারা শিরকের সমুদ্রে স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কেটেছিল?

হে যুবকসম্প্রদায়, তারা কারা? তাদের পরিচয় কী? ইতিহাস পাঠ করে দেখো। সীরাত অধ্যয়ন করো। নিম্নোক্ত উদাহরণগুলো পড়ে দেখো–

তরুণ যুবাইর ইবনে আওয়াম রা.

ইসলামের অন্যতম যোদ্ধা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিশিষ্ট সাহাবী, দুঃসাহসী সৈনিক, বীর-বাহাদুর, ইসলামী দাওয়াতের অন্যতম স্তম্ভ হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রা.। ইসলাম গ্রহণের সময় এই মহামনীষীর বয়স কত ছিল? তখন তার বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর!! অর্থাৎ আমাদের বর্তমান সময় অনুযায়ী সর্বোচ্চ নবম বা একাদশ শ্রেণি পড়ুয়া ছাত্রের বয়সের।

আজকের একজন মাধ্যমিক বা উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ুয়া ছাত্র কি সেই চিন্তা-ভাবনা করে, সেই স্বপ্ন দেখে, সেই আশা ব্যক্ত করে ও সেই রকম আমল করে, যেমন হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম রা. সেই বয়সে চিন্তা-ভাবনা করতেন, স্বপ্ন দেখতেন, আশা ব্যক্ত করতেন ও আমল করতেন? নিশ্চয় এখানে কোন গলদ আছে।

তাই ভাবা দরকার। নিজেদের হিসাব-নিকাশ ও আত্মসমালোচনার জন্য একটু ভাবা দরকার।

কেন আজ মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এমনকি ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রের মেধায় সে সকল বস্তু স্থান পায় না, যা দেশ-জাতি নির্বিশেষে গোটা বিশ্বের জন্য কল্যাণকর? কেবল কতিপয় অশ্লীল সিনেমা, ধ্বংসাত্মক গান-বাজনা, জীবন-বিধ্বংসী বিনোদন ছাড়া তাদের মাথায় অন্য কিছু জায়গা পায় না? কেন তারা টেলিভিশন, ভিডিওগেম ও ইন্টারনেটের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে? কেন তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিলিয়ার্ড হলে ও নীলনদের তীরে সময় নষ্ট করে? অথচ সামান্য সময় দ্বীন, ইলম, দাওয়াত, মহৎ উদ্দেশ্য বা গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যয় করে না?

এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা দরকার!!

যুবক তলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.

মক্কায় বেড়ে ওঠা মুসলিম জামাতের অন্যতম প্রধান খুঁটি, আল্লাহর পথের অন্যতম দায়ী, বীর যোদ্ধা– যার ক্ষমতা, দক্ষতা, সাহসীকতা ও অগ্রসরতার সাক্ষ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়– দু'-হাত উজার করে যারা আল্লাহর পথে দান করেছিলেন তাদের উপমা তিনি, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'তলহাতুল খায়ের [কল্যাণময়ী তলহা] বলে সম্বোধন করেছিলেন, তিনি হলেন হযরত তলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ রা.।

এই মহান সাহাবী মাত্র ষোলো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন!!

যুবক সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা.

হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. বিশিষ্ট মহান সাহাবী। তিনি একক ব্যক্তি, যার শানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পিতা-মাতা উৎসর্গের ঘোষণা দিয়েছেন। ওহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

ارْمِ سَعْد فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ. (رواه الترمذي)

'সা'দ, নিক্ষেপ করো। তোমার প্রতি আমার বাবা-মা উৎসর্গিত হোক।'

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী রহ. হযরত আলী ইবনে আবি তালেব রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইসলামগ্রহণের সময় এই মহান সাহাবীর বয়স কত ছিল?

তার বয়স হয়েছিলো মাত্র সতেরো বছর!!

নওজোয়ান আরকাম ইবনে আবিল আরকাম আল-মাখযুমী রা. এর কীর্তি

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আরকাম ইবনে আবিল আরকাম আলমাখযুমী রা.। যার নামের মাঝে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রয়েছে বহু উপদেশ। যিনি মক্কায় নিজ বাড়িতে পূর্ণ তেরো বছর ইসলামী দাওয়াতের স্থান দিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন মাখযুম গোত্রের সদস্য। হাশেম গোত্রের সঙ্গে যাদের বিরোধিতা সর্বদা লেগেই থাকত। সেই হাশেমী গোত্রের নবীকে তিনি নিজ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এতে তিনি স্বগোত্র ও সাথী-সঙ্গীদের পক্ষ থেকে চরম কষ্ট সহ্য করেছিলেন। ভুলে গেলে চলবে না, মাখযুম গোত্রের সর্দার ছিল আবু জেহেল। মক্কায় যার নির্মমতা-নিষ্ঠুরতা ও অহংকারের কথা কারও অজানা ছিলনা। সে হলো মুসলিম জাতির ফেরাউন। যদি তার গোত্রের কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তার সাহাবীদেরকে তার ঘরে আসতে দেখত, তাহলে তার কেয়ামত ঘটে যেত। তার ওপর দিয়ে বয়ে যেত অত্যাচারের স্টিম রোলার। হযরত যায়েদ আরকাম ইবনে আবিল আরকাম রা. ইসলামের খাতিরে এই বিপদকে গ্রহণ করেছেন। নিজেকে উৎস্বর্গ করেছেন।

জানেন ইসলামগ্রহণের সময় এই মহান সাহাবীর বয়স কত ছিল?

মাত্র ষোলো বছর!!

কল্পনা করা যায়?!

আমরা যখন এসব চিরস্মরণীয় অমরদের নাম পাঠ করি– যুবাইর, তলহা, সা'দ, আরকাম রা.– আমাদের মনে হয় তারা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। বস্তুত তারা অনেক বড় ছিলেন। তবে বয়সের বড় নন, তারা বড় ছিলেন সম্মান-মর্যাদা, বিবেক-বুদ্ধি, চেষ্টা-পরিশ্রম, ঈমান-আমল ও চরিত্রমাধুর্যে। এ হিসেবে তারা আক্ষরিক অর্থেই বড়– সন্দেহ নেই। তবে বয়স বিবেচনায় তারা তত বড় ছিলেন না, যতটা আমরা কল্পনা করি। তাদের বয়স ছিল তখন পনেরো, ষোলো বা সতেরো।

কিশোর আলী ইবনে আবু তালেব রা.

পাঠক, আপনি কি জানেন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রা. কে? তিনি সেই শিশু যার বয়স ছিল দশ বছর। মাত্র দশ বছর!! এই বয়সেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যাতায়াত করতেন। কুরআনের বাণী শুনতেন। সুবহানাল্লাহ!!

এতে চিন্তার বিরাট খোরাক লুকিয়ে আছে। একটু চিন্তা করে দেখেছেন কি? দেখুন মাত্র দশ বছরের শিশু, যার শরীয়তের বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা নেই, সে এমন সব সূক্ষ্ম বিষয় আয়ত্ত করেছে, যা বহু মাশায়েখের বুদ্ধিতে ধরে না! তিনি একত্ববাদের চিন্তা, নবুওয়াত ও রেসালাতের চিন্তা, ওহী ও ফেরেশতাদের

চিন্তা, কেয়ামত দিবসে পুনরুত্থানের চিন্তা, জান্নাত-জাহান্নামের চিন্তা, ঈমান-আমলের চিন্তা, আল্লাহর জন্য জীবন, আল্লাহর জন্য মরণের চিন্তা উপলব্ধি করেছিলেন।

মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি এসব সূক্ষ্ম বিষয় আয়ত্ত করেছিলেন!!

আরেকটু ভেবে দেখুন, এই ছোট্ট শিশুর সময়জ্ঞান ও অবস্থাজ্ঞানও ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণ। তিনি জানতেন কীভাবে ইসলামের বিষয়টি নিকটাত্মীয়দের কাছে গোপন করা যায়, কীভাবে গোপনে দারুল আরকামে যাওয়া যায়, কীভাবে গোপনে নামায আদায় করতে হয়, মানুষের আড়ালে কীভাবে কুরআন তেলাওয়াত করা যায়?!!

এই ছোট্ট শিশুর বিবেক-বুদ্ধি আমাদের কল্পনাজগতের চেয়েও অনেক প্রশস্ত ছিল।

কতিপয় বাবা, অভিভাবক, শিক্ষক ও মুরব্বি সামান্য কঠিন বিষয় হলেই দুশ্চিন্তায় পড়ে যান, না জানি সন্তানের জন্য অধিক চাপের কারণ হয়ে যায় কি না? তারা সন্তানদের কঠিন বিষয় চাপিয়ে দিতে নারাজ– মনে করেন, এতে মস্তিষ্ক-বিভ্রাট ঘটতে পারে! ফলে তারা অতি সাধারণ বিষয় সন্তানদের পাঠ করান। কিছু অন্তসারশূন্য গল্পের বই, কার্টুন ভিডিও, কম্পিউটার গেমস, খেলোয়ার ও শিল্পীদের নাম জানাকেই যথেষ্ট মনে করেন। এতে যে সন্তানদের বিরাট ক্ষতিসাধিত হয়, তা তারা উপলব্ধি করতে পারেন না!! শিশুদের প্রতিভা ও সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

শুধুমাত্র হযরত আলী রা.-ই একমাত্র উদাহরণ নন, বরং এমন বিচক্ষণ শিশুর উপমা ইসলামের ইতিহাসে ভরপুর। তারা এতো বিপুলসংখ্যক যে, তাদের সবার নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সাহাবী তনয় প্রত্যেক শিশুরই এমন মেধা ও বিচক্ষণতা ছিল, যা তাদের মুখস্থশক্তি, মেধার প্রখরতা, গভীর বুদ্ধিমত্তা ও উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ বহন করে।

কিশোর যায়েদ ইবনে সাবেত রা.

পড়ে দেখুন, মহান শিশু হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. এর স্বপ্নের গল্প, যার বয়স ছিল মাত্র তেরো। তখনো তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হননি। অবয়ব আকৃতিতে ছিলেন অতি ক্ষুদ্রকায়।

কিন্তু সুবহানাল্লাহ! ক্ষুদ্রকায় ও অল্প বয়সের হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহর চিন্তায় তিনি সর্বদা চিন্তিত থাকতেন।

একদিনের ঘটনা–

ছোট্ট শিশু যায়েদ হঠাৎ একদিন শুনলেন মুসলিম বাহিনী মুশরিকদের মুখোমুখি হবার উদ্দেশ্যে বদর অভিমুখে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ সংবাদ শুনে শিশু যায়েদের ছোট্ট হৃদয়ে ধর্মীয় চেতনাবোধ তীব্রাকার ধারণ করে। তিনি তলোয়ার হাতে তুলে নিলেন। তলোয়ারটি আকারে তার চেয়েও লম্বা ছিল!! মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদানের অভিপ্রায়ে রওনা হলো ছোট্ট এই শিশুটি।

আন্তরিকতার সাথেই সে জিহাদ করতে প্রস্তুত হয়েছিলো!! তার বুদ্ধিমত্তা জিহাদকে ধারণ করেছিল। সেই সাথে এ পথে শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি সাহায্য করতে হবে। কষ্ট, পরিশ্রম করতে ও যখম হতে হবে। এ কথা জেনেই সে বেরিয়েছিল।

উচ্চাভিলাষী ছোট্ট শিশুটি মুসলিম সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য মুজাহিদদের পাশাপাশি তাকেও অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু তার শারীরিক গঠন ক্ষুদ্রাকায় ও অল্প বয়স দেখে রাসুল সা. তার ক্ষতির আশঙ্কা করেন। তাকে ফিরিয়ে দেন। বাহিনীতে যোগদানের অনুমতি তাকে দিলেন না।

এটা ছিল হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের জন্য বাস্তবেই বড় কষ্টের। তিনি তা মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি তার মা 'আন নাওয়ার বিনতে মালিক' রা.-এর কাছে গিয়ে যুদ্ধে যোগদান করতে না পারার দু:খে কাঁদতে শুরু করেন। ক্রন্দনরত অবস্থায় মায়ের কাছে এসে বলতে থাকেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদে অংশ নিতে বারণ করেছেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী দয়ালু অভিভাবক মা সন্তান যায়েদ ইবনে সাবেতের ক্ষমতা ও অনুভূতির কথা তো জানেন। তিনি তাকে বললেন, চিন্তা কোরো না বাবা! তুমি অন্য পন্থায় ইসলামের খেদমত করতে পার। তলোয়ারে জিহাদ করতে না পারো কলম ও ভাষাজ্ঞান দিয়ে তো জিহাদ করতে পারো।

দয়ালু মা আননাওয়ার বিনতে মালেক সন্তান যায়েদের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে পরিবর্তন ঘটান– যেমন আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করি– যে, আমলের ক্ষেত্র অনেক সুপ্রশস্ত। তা ছাড়া সবার ক্ষমতা ও সামর্থ্য একরকম নয়। একেকজনের ক্ষমতা ও সামর্থ্য একেক রকম হয়ে থাকে। সামর্থ্য ও ক্ষমতায় মানুষ বৈচিত্র্যময়। কেউ একটি কাজ করতে না পারলে তার জন্য অন্যত্র সুযোগ আছে। প্রত্যেকের জন্য সেই কাজকে সহজ করে দেওয়া হয়, যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বুদ্ধিমতী মা আবেগপ্রবণ ছেলেকে বললেন, তুমি তো লেখাপড়ায় খুব ভালো। আজকাল লেখাপড়ায় ভালো ছেলে পাওয়া যায় না বললেই চলে। তুমি তো অনেকগুলো সূরা ভালোভাবে মুখস্থ করেছ। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে যাবো। আমরা দেখবো, কীভাবে এই প্রতিভাকে ইসলামের খেদমতে ব্যয় করা যায়?

দেখুন চিন্তাশক্তির প্রখরতা, চেষ্টার একনিষ্ঠতা ও দৃষ্টির গভীরতা!!

ঠিকই কয়েকদিন পর সে তার গোত্রের কয়েকজন মানুষের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলেন। তাদের সবার চাওয়া কোনো না-কোনোভাবে যায়েদকে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমতে নিয়োজিত করা।

তারা বললেন, হে আল্লাহর নবী, আমাদের আদরের সন্তান যায়েদ ইবনে সাবেত কুরআনের সতেরোটি সূরা মুখস্থ করেছে। সে বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করে, ঠিক যেভাবে কুরআন আপনার অন্তরে নাযিল হয়েছে। এ ছাড়াও সে খুব মেধাবী, ভালো লিখতে-পড়তে জানে। তার খুব ইচ্ছা, আপনার সান্নিধ্যে থাকা ও নৈকট্য লাভ করা। আপনি চাইলে তার মুখ থেকেই শুনুন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ রা. এর দিকে মনোনিবেশ করলেন। তার মুখস্থশক্তি ও প্রতিভার পরীক্ষা নিলেন। মুখস্থশক্তির ঊর্ধ্বে তার যে প্রতিভা সেটার মূল্যায়ন করলেন। তার বয়সকে ছোট মনে করলেন না। তাকে ছোট চোখেও দেখলেন না; বরং তার কাছে এমন কিছু প্রত্যাশা করলেন, যা বর্তমান যুগে তাদের কাছেই প্রত্যাশা করা হয় যারা শিক্ষা-দীক্ষা ও গবেষণায় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন– হে যায়েদ, তুমি আমার জন্য ইহুদীদের ভাষা শেখো। কারণ, আমি যা বলি (ঠিকমত তারা তা লিখছে কি না?) তাতে আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারি না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ রা. কে একটি অপরিচিত ভাষা– তৎকালে যার রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল অনস্বীকার্য– শেখার নির্দেশ দিলেন। কারণ, মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যকার যুদ্ধ ও কূটনৈতিক অঙ্গনে এর প্রয়োজন ছিল সীমাহীন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বড় দায়িত্ব যায়েদ রা. এর কাঁধে অর্পণ করলেন, অথচ তিনি ছিলেন একজন তেরো বছরের বালক!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। যায়েদ রা. খুব অল্প সময়ে হিব্রু ভাষায় অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি হিব্রু ভাষায় অনর্গল কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা অর্জন করেন।

কিছুদিন পর তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিরিয়াক ভাষা শেখার নির্দেশ দেন। তৎকালে সিরিয়াক ভাষা ছিল অতি উচ্চাঙ্গের একটি ভাষা। যায়েদ রা. এই ভাষায়ও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এভাবেই যায়েদ রা. মুসলিম রাষ্ট্রের দোভাষী ও মুখপাত্রে পরিণত হন। মুসলিম অমুসলিম দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও চিঠিপত্র লেনদেনের ক্ষেত্রে স্থায়ী অংশগ্রহণকারীতে পরিণত হন।

আর এর সবকিছুই হয়েছে মাত্র তেরো বছর বয়সে।

পাঠক, দেখেছেন, যুবকের সম্ভাব্যতা!?

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশ্বস্ত মনে করেন। তার প্রতি আস্থা রাখেন। চিঠিপত্র, কূটনৈতিক আলোচনার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাকে আমানতদার মনে করেন। ঐশী বানী সংরক্ষণে আস্থাভাজন মনে করে তাকে ওহী লিপিবদ্ধকরণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এরপর থেকে একসাথে অনেক আয়াত নাযিল হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে রা. ডেকে বলতেন, যায়েদ, লেখো। আর যায়েদ রা. তা লিখে রাখতেন। এভাবে তিনি ওহী লিপিবদ্ধকারী সাহাবীতে পরিণত হন।

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন। মুসলমানগণ ভয়াবহ বিপদ আঁচ করলেন। যখন তারা কুরআনের কোনো একটি আয়াত বা একাধিক আয়াত হারিয়ে ফেলতেন, তখন তাদের পেরেশানির কোনো অন্ত থাকত না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশায় কুরআন একটি কিতাব আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ফলে তারা কুরআনের কিয়দংশ বা কমপক্ষে নাযিলের বিন্যাস হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা করলেন।

হযরত ওমর রা. খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর রা. কে কুরআন একটি কিতাবাকারে সংকলনের পরামর্শ দেন। দীর্ঘ পর্যালোচনা ও পরামর্শের পর হযরত আবু বকর রা. হযরত ওমর রা. এর পরামর্শ গ্রহণ করেন। কিন্তু একটি বড় সমস্যা থেকেই যায়। সেটি হলো এই মহান দায়িত্ব কে পালন করবে? আবু বকর রা. যায়েদ ইবনে সাবেতের চেয়ে এ কাজের অধিক যোগ্য কাউকে মনে করলেন না। কারণ, এই কাজটি অত্যন্ত বিপজ্জনক দায়িত্ব। আর যায়েদ রা. একসাথে ভাষাজ্ঞানে পণ্ডিত ও ওহী লিপিবদ্ধকারী। তিনি কুরআনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। তিনি জানেন, কোন আয়াত কোথায় কীভাবে কোন অবস্থার প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। তিনি কুরআন নাযিলের বিন্যাস জানেন। পূর্বাপর আয়াতের সঙ্গে যে কোন আয়াতের মিল সম্পর্কে তার জ্ঞান পর্যাপ্ত। এসব গুণাবলির বিচারে খলীফাতুল মুসলিমীন তাকে এই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন।

এভাবেই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. মুসলিম উম্মাহর এই মহান খেদমতের আঞ্জামদাতা হিসেবে নির্বাচিত হন। অথচ তখন তার বয়স ছিল মাত্র একুশ বা বাইশ বছর। অর্থাৎ বর্তমান যুগের ভার্সিটির লেখাপড়া এখনো শেষ হয়নি এমন ছাত্রের সময়বয়সী। এই বয়সে তার কাঁধে যে গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা একদল বিজ্ঞ পণ্ডিত ও শিক্ষকদের কাঁধে অর্পিত হওয়ার কথা। তা ছাড়া তখনো বিশিষ্ট বয়োবৃদ্ধ সাহাবীদের সুবিশাল জামাত জীবিত ছিলেন। তথাপি যুবক ও ছোট হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতার কারণে তাকে এই গুরুগম্ভীর কাজে অগ্রগণ্য মনে করা হয়েছে।

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. বলেন–

فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أَهْوَنُ علي مما أمروني به من جمع القرآن. (رواه الإمام أحمد)

'আল্লাহর শপথ! যদি তারা আমাকে কোনো পাহাড় স্থানান্তরের নির্দেশ দিতো, তা আমার জন্য কুরআন সংকলনের চেয়ে অধিক সহজ মনে হতো।'[৭]

এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়েও হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা. সফলতার স্বাক্ষর রাখেন, যা করতে একপ্রজন্ম আলেমের প্রয়োজন।

সত্যিই যুবকের ক্ষমতা ও প্রতিভা অকল্পনীয়!!

---

[৭] মুসনাদে আহমদ : ২১১৩৫

উসামা ইবনে যায়েদ রা.

ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আরেক যুবকের বীরত্বের গল্প শুনুন...

আমরা অধিকাংশই তার মহান ব্যক্তিত্বের কথা রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার বিজ্ঞতাসূলভ নেতৃত্ব দেখে জানতে পেরেছি। তবে এ যুদ্ধেই সর্বপ্রথম তার বীরত্ব প্রকাশ পায়নি। ইতিহাসের পাতায় তার বীরত্বগাথা এরও পূর্বে অঙ্কিত হয়েছে। তিনি হলেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা.।

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পূর্বে তিনি অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামী ইতিহাসে তার অবদান স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য।

উদাহরণস্বরূপ সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত সারিয়ায়ে গালেব ইবনে আবদুল্লাহ রা.। তখন হযরত উসামা রা.-এর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। তা ছাড়া মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধসহ অন্যান্য যুদ্ধ তো আছেই।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. ছিলেন সর্বজনবরিত ও শ্রদ্ধেয় প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। সাহাবায়ে কেরাম যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে ভয় পেতেন, অথবা কোন কিছু চাইতে ভয় পেতেন, তখন হযরত উসামা রা. কে সে বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আলোচনা করার আবেদন করতেন। অথচ তিনি বয়সের দিক থেকে ছিলেন অনেক ছোট। সে সময় তার বয়স ছিল সর্বোচ্চ ১৫ বছর। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তার অবস্থান ও জ্ঞান-গরিমার কারণে এ ধরনের বিষয়ে তাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো।

শুধু এ কারণেই নয়, বরং এর চাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কারণে তাকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। সেটি কী?

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত মুরাইসি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে বেদনাদায়ক মর্মস্পর্শী ইফকের ঘটনা (মা আয়েশা রা. সম্পর্কে অপবাদ রটানোর ঘটনা।) এই যুদ্ধে সংঘটিত হয়।

একদল নিন্দুক মা আয়েশা রা. সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রটায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন? কঠিন সময় পার করছিলেন তিনি। সরাসরি ওহী নাযিল হতেও দেরি হচ্ছিল (একমাস পর ওহী নাযিল হয়)। চারদিকে যে গুজব ছড়াচ্ছিল তাতে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন,

পরিস্থিতি একেবারেই সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানী-গুণী সাহাবাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে চাইলেন। সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি কতিপয় জ্ঞানী-গুণী সাহাবীর কাছে এই ভয়াবহ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য পরামর্শ গ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কার কাছে পরামর্শ চাইবেন? তিনি মাত্র দু'জনের কাছে পরামর্শ চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

একজন হলেন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা.

অন্যজন হযরত আলী ইবনে আবু তালেব রা.।

সে সময় হযরত উসামা রা. এর বয়স ছিল মাত্র বারো বছর!

এ বয়সের বালকের পক্ষে তো ঘটনাটি বোঝারই কথা না– কেউ কেউ এমন ধারণাও করতে পারেন। ঘটনার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও নেপথ্য কি হতে পরে– তার বোঝার কথা না। এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান তো অনেক কঠিন ও দুরূহ বিষয়!! কিন্তু জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারো বছরের ছোট্ট বালক উসামার মাঝে সেই যোগ্যতা ও প্রতিভা অবলোকন করেন, যার মাধ্যমে সে এমন কঠিন বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ প্রদান করতে সক্ষম।

ভেবে দেখুন, পরামর্শপ্রার্থী কে? সৃষ্টির সেরা, দুনিয়া-আখেরাতের সরদার, মানবজাতির সেরা জ্ঞানী, নিষ্পাপ জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এটি হযরত উসামা রা. এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। বরং এটি বিশ্বের যুব সমাজের শ্রেষ্ঠতম গুণ। কোনো একজন যুবকের চিন্তা-ফিকির ও বিচার-বুদ্ধির জগতে এই উঁচু স্তরে উপনীত হওয়া গোটা যুবসমাজের জন্য বিশাল দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়, তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও শক্তির বিকাশে সুবিধা গ্রহণের পথ দেখায়। আল্লাহপ্রদত্ত গুণাবলির ওপর পড়ে থাকা আস্তরণ সরিয়ে দেয়।

আলোচিত বিষয়টি ছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে এক আশ্চর্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আর তা হলো, উসামা ইবনে যায়েদ রা. কে সেনাপতি বানিয়ে সিরিয়াতে রোমানদের বিরুদ্ধে বিশাল এক মুসলিম বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন হযরত উসামার বয়স ছিল মাত্র আঠারো বছর। বাস্তবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই সিদ্ধান্ত ছিল আশ্চর্যকর! এ বিষয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

উসামা ইবনে যায়েদ রা. এই যুদ্ধে একদল বালককে পরিচালনা করেননি কিংবা একদল সাধারণ লোক যাদের রণকৌশল জানা নেই তাদের নেতৃত্ব দেননি; তিনি

এই যুদ্ধে এক বিশাল আকৃতির রণশাস্ত্রে পারদর্শী শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীকে পরিচালনা করেছেন। যারা সার্বিক দিক থেকে ছিলেন অগ্রগামী। যুদ্ধ, সামরিক-পরিকল্পনা, ঈমান ও ইসলামে অগ্রগামী, বিচক্ষণতা ও মান-মর্যাদার দিক থেকে তারা তৎকালের শ্রেষ্ঠ দল ছিলেন। সেই দলকে দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন আঠারো বছর বয়সের নওজোয়ান হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা.।

আসুন বিষয়টা নিয়ে একটু গভীর পর্যালোচনা করি।

তখন কি মদিনায় হযরত উসামা রা. এর চেয়ে অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন কোন নেতা ছিলেন না?

উত্তর সুস্পষ্ট! নিশ্চয়ই তখন মদিনা মুনাওয়ারায় এমন বহু মানুষ ছিলেন যারা হযরত উসামার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ। আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, খালেদ ইবনে ওয়ালিদ, কা'কা' ইবনে আমর, শুরাহবিল ইবনে হাসানা, মুসান্না ইবনে হারেসা, আমর ইবনে আস প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবায়ে কেরাম তখন মদিনায় ছিলেন।

তাহলে কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাদ দিয়ে যুদ্ধের পতাকা হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. এর হাতে তুলে দিলেন? কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীর ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও বিশাল বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে হযরত উসামাকে নির্বাচন করলেন?!

ইশারা সুস্পষ্ট। উদ্দেশ্য মহৎ।

যুবসমাজের ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য, মেধা ও প্রতিভাকে উম্মাহর সামনে তুলে ধরার মহৎ লক্ষ্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সিদ্ধান্ত নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিপ্রায় ছিল এ কথা বোঝানো যে, একজন আঠারো বছরের যুবকের মাঝেও একদল বিচক্ষণ, বিজ্ঞ, বীর বাহাদুর পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে।

এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন প্রজন্মকে যোগ্য করে গড়ে তোলার এবং যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করার নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। যদি প্রধান সেনাপতি জীবনভর সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন, অন্যদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ না দেন, তবে তা নিঃসন্দেহে জাতির জন্য মহা ক্ষতির কারণ। পক্ষান্তরে যদি কেউ যুবসমাজকে ছোটবেলা থেকেই প্রশাসন ও নেতৃত্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করে, তাহলে যুবসমাজের জীবন হবে স্বর্ণোজ্জ্বল, পূর্ববর্তীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। এই যুবসমাজ হবে প্রতিষ্ঠিত ও অপ্রতিরোধ্য। শুধু বর্তমান নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্যও হবে তারা কল্যাণকর।

উল্লেখ্য, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী কোন শরীরচর্চা, আনন্দ-বিনোদন, কিংবা স্বাভাবিক কোনো যুদ্ধ জয় করতে যাচ্ছে না, বরং তারা তৎকালীন পৃথিবীর পরাশক্তি রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বের হয়েছে। রোমানরা তখন কূটনীতিতেও বিশ্বসেরা জাতি ছিল। আর যাদের ছিল স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত ও অসংখ্য যুদ্ধজয়ের অভিজ্ঞতা।

আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করুন–

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাতে যুদ্ধের পতাকা তুলে দিয়ে মুসলিম জাতিকে কোনো অবস্থাতেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোভাবে জানতেন, এই যুবক পূর্ণ সফলতার সাথে এই গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিতে সক্ষম হবে। উপরন্তু কতিপয় সাহাবী তার হাতে পতাকা তুলে দেওয়াতে কিছুটা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার পরও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের অন্তরে উক্ত বিষয়টি গেঁথে দেয়। যে বিষয়টি বহু গুণীজন মুরব্বিদের কাছে অস্পষ্ট থাকে। তা হলো **'যুবসমাজের ক্ষমতা অপরিসীম'**।

যুবক উসামা ইবনে যায়েদ রা. মাত্র কয়েক বছরে নেতৃত্ব ও পরিচালনাশাস্ত্র, যুদ্ধ ও রণশাস্ত্র এবং ফিকাহশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তাই তো তিনি এই মহান গুরুদায়িত্ব সফলভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয়েছেন।

পাঠকবৃন্দ! হযরত উসামা রা. বর্তমান যুবসমাজের ন্যায় রাজকীয় জীবনযাপন করতেন? তাও না। তিনি আজকের যুবক সম্প্রদায়ের মতো এত উন্নত পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করেননি। তিনি বর্তমান যুবসমাজের মতো এত উন্নত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন না।

তিনি ছিলেন সহজ সরল প্রকৃতির। সাধারণ বাবার একজন সাধারণ সন্তান। তার বাবা ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কৃতদাস যায়েদ ইবনে হারেসা রা.। যিনি বেচাকেনা হতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে স্বাধীন করেছিলেন। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, উসামা রা. ছিলেন সহায়-সম্বলহীন অসহায়-দরিদ্র। তিনি কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি, রাজা-বাদশা বা আমির-উমারার আদরের সন্তান ছিলেন না।

উসামা সুঠাম সুদর্শন যুবকও ছিলেন না। না চেহারা-অবয়ব, না শারীরিক গঠন–কোনো দিক থেকেই তিনি সুদর্শন ছিলেন না। এতে এ কথা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত সফলতা বংশ, সম্পদ বা শারীরিক অবয়বে নিহিত নয়; বরং তা নিহিত থাকে দ্বীন-ধর্ম, জ্ঞান-গরিমা, যোগ্যতা ও প্রতিভার মাঝে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসামার শানে যথাযথ বলেছেন– যা প্রত্যেক মুসলিম যুবকের জন্য গর্বের বস্তু। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন–

أن رسول الله (ص) بعث بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته فقام رسول الله (ص) فقال : إن تطعنوا في إمارته ، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. (متفق عليه)

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সৈন্য পাঠালেন। উসামা ইবনে যায়েদকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। কতিপয় লোক তার নেতৃত্বকে অস্বীকার করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বললেন– 'যদি তোমরা তার নেতৃত্বে ছিদ্রান্বেষণ করো, তবে মনে রাখবে তোমরা ইতিপূর্বে তার বাবার নেতৃত্বেও ছিদ্রান্বেষণ করেছিলে! আল্লাহর শপথ! যদি সে বাস্তবে নেতৃত্বের যোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে সে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ।'[৮]

আহ! যুবসমাজ কত বেশি মর্যাদাবান! যদি তারা বুঝত!

আহ! সমাজ ও জাতি উন্নতি-অগ্রগতির চরম শিখরে উত্তীর্ণ হতো যদি যুবসমাজ তাদের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা করত এবং সাধ্যমতো উত্তম কাজে নিজেদের নিয়োজিত করত। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. এর মাঝে আমাদের জন্য রয়েছে বহু উপদেশ।

আমার মন চাচ্ছে, ইসলামের স্বর্ণযুগের যুবসমাজের অবদান ও কীর্তি সবিস্তারে আলোচনা করি। কিন্তু এতে আলোচনার কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাবে। তা ছাড়া যুবসমাজের যাবতীয় কীর্তি সবিস্তারে আলোচনা করাও এই কিতাবের মূল উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমি উদাহরণস্বরূপ কয়েকজনের কথা উল্লেখ করেছি মাত্র। আগ্রহী পাঠকদের প্রতি বিখ্যাত সিরাতগ্রন্থসমূহ হতে মুসআব ইবনে উমাইর, সামুরা ইবনে জুনদুব, জা'ফর ইবনে আবু তালেব, আস'আদ ইবনে যুরারা, মু'আজ ইবনে জাবাল, সা'দ ইবনে মু'আজ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস, বারা ইবনে আজেব, যায়েদ ইবনে আরকাম প্রমুখ সাহাবা আজমাঈন [রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আলাইহিম আজমাঈন]-এর জীবনী পাঠের আবেদন রইল। আল্লাহ তা'আলা তাদের মতো যুবক-শ্রেণি যুগে যুগে সৃষ্টি করুন– আমীন।

---

[৮] বুখারী : ৪১৯৯

কেবল সাহাবীদের মাঝেই এমন উপমা বিদ্যমান ছিল না, বরং ইসলামী ইতিহাসের প্রত্যেক যুগেই এমন যুবসমাজের উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো। আপনি চাইলে আবু ইদরীস খাওলানী, মুহাম্মদ বিন কাসেম, ইমাম বুখারী, ইমাম নববী, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, ইমাম কুতয, মুহাম্মদ ফাতেহ, আবদুর রহমান দাখেল, আবদুর রহমান নাসের প্রমুখ মহামনীষীর জীবনী অধ্যয়ন করতে পারেন।

মুসলিম জাতি কখনো মনীষীশূন্য হবে না!

আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মানিত করুন– আমীন।

কেন এই ব্যবধান?

একটু বিরতি নিয়ে আত্মজিজ্ঞাসা করা দরকার।

গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

বর্তমান যুবসমাজ ও পূর্বেকার যুবসমাজের মাঝে কেন এই বিশাল ব্যবধান বিরাজমান? কেন তাদের সম্ভাবনা, শক্তি ও সৃজনের মাঝে বিপুল ফারাক?

আজকের যুবসমাজ কোন আদর্শে আদর্শবান? আর তাদের কোন আদর্শে আদর্শবান হওয়া কাম্য ছিল?

জাতির ইতিহাস ও বর্তমান বাস্তবতার মাঝে কেন আজ এত ব্যবধান?

এ কথা নিশ্চিত, শুধু যুবসমাজের দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই। ভুল শুধু যুবক-শ্রেণিরই নয়, বরং আজকের সমাজের এই অধঃপতন সর্বশ্রেণির সমন্বিত ভুলের মাশুল। এ এক মহাবিপর্যয়। এতো মুসলিম উম্মাহর অধঃপতন। এই বিপর্যয় ও অধঃপতনই আজ আমাদের এই অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ফলে বর্তমান যুবসমাজ ও তৎকালীন যুবসমাজের মাঝে বিরাট ব্যবধান বিরাজ করছে।

দীর্ঘ অধ্যয়ন ও গবেষণার পর আমার কাছে মনে হয়েছে, এই অধঃপতনের অনেক কারণ রয়েছে। এর জন্য প্রয়োজন আরো গভীর গবেষণা ও পর্যালোচনা। প্রয়োজন নির্বিঘ্ন প্রচেষ্টা ও একনিষ্ঠ সাধনা এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণের বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। অন্যথায় নির্ঘাত সীমাহীন দুঃখ ও অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। যে জাতির যুবক-শ্রেণি ধ্বংসের কবলে পতিত হয়েছে, সে জাতি কখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না।

তাই আমরা অকার্যকর চিন্তা-ভাবনা ও অনর্থক গল্পগুজবে সময় না কাটিয়ে একটি সমাধানমূলক কার্যকরী আলোচনার অবতারণা করার প্রচেষ্টা করছি, যার ফলাফল হবে স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী এবং যা দুই প্রান্তের যুবসমাজের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনবে, শুধু তা-ই নয়, বরং চিরতরে এই ব্যবধান মিটিয়ে দেবে– ইনশাআল্লাহ।

এ পর্যায়ে আমি কতিপয় কারণ ও তার প্রতিকার উল্লেখ করছি। আমাদের উচিত, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য স্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়নে সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কারণ : ১

ইসলামী প্রতিপালন নীতি বর্জন

এটি বর্তমান যুবসমাজের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। ইসলামী অনুশাসন ও আদর্শে লালিত-পালিত না হলে যায়েদ ইবনে সাবেত, উসামা ইবনে যায়েদ, মু'আয ইবনে জাবাল, মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামুহ, মু'আয ইবনে আফরা রা. কীভাবে বিকশিত হতেন?! কে তাদের চিনত, জানত?

ইসলামই এ সকল বীর ও ক্ষণজন্মা মহামনীষীদের তৈরি করেছে। ইসলামই তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছে। ইসলামই তাদের সম্ভাবনাকে জাতির খেদমতে নিয়োজিত করেছে। দুনিয়াবাসীর কল্যাণে তাদের পরিচালিত করেছে।

আজ জাতি যুবসমাজের উন্নতি ও বিকাশের জন্য ইসলামী নীতিমালা উপেক্ষা করে শত শত নীতিমালা প্রণয়ন করছে। ফলে জাতি সফলতার রহস্য হারিয়ে ফেলছে, হেদায়েত ও সংশোধনের পথে পরিচালিত হচ্ছে না, সংকীর্ণতা ও হতাশার জীবনযাপন করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. (طه)

'যে আমার স্মরণে বিমুখ হবে, সে অবশ্যই সংকুচিত জীবনযাপন করবে।'[৯]

---

[৯] সূরা ত্বহা (২০) : ১২৪

যুবসমাজের মাঝে ইসলামী প্রতিপালন বাস্তবায়নের জন্য শর্ত হলো, প্রত্যেক যুবকের একজন দক্ষ আলেমে দ্বীন মুরুব্বি হিসেবে থাকা। মুরুব্বিহীন ধ্যানমগ্ন সময় কাটালেও যুবসমাজের মাঝে পরিবর্তন আসবে না। পরিবর্তনের জন্য দরকার দক্ষ মুরুব্বির নিয়মতান্ত্রিক প্রতিপালন। কাজেই যুবসমাজ মুরুব্বিশূন্য হয়ে গেলে তারা ভুল পথে পরিচালিত হবে, নির্মাণ ও সংস্কারমূলক কাজ বাদ দিয়ে ধ্বংস ও অপসংস্কৃতির পথে ধাবিত হবে।

দ্বীনিজ্ঞান সম্পন্ন একজন মুরুব্বীকর্তৃক নির্দেশিত প্রতিপালনই মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ অভিমুখী করে তোলে। আফসোস! আজ যুবসমাজ মুরব্বিশূন্য হওয়ার ফলে তারা কুরআন-সুন্নাহ থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এ কারণে দ্বীন যাদের প্রধান আদর্শ হওয়ার কথা ছিল, তাদের কাছে আজ তা হেলাফেলার বস্তু। দ্বীন যেন তাদের কাছে আদর্শলিপি বইয়ের মতো ভাসাভাসা কিছু নিয়ম-কানুন, যা তারা পাঠ্যপুস্তকে পাঠ করে।

বর্তমান মুসলিম যুবসমাজের মাঝে এমন কিছু বস্তুর দিকে নিজেদের সম্বোধিত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে, যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কোনো দলিল নাযিল করেননি এবং মুসলিম উম্মাহর সোনালি যুগে মহামনীষীগণের মাঝেও যে বিষয়ের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তারা কেউ কেউ নিজেদের আরব গোত্রের দিকে সম্বোধন করে নিজেদের বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা মুসলিম ভ্রাতৃত্ব থেকে আলাদা করে ফেলে। তারা কেউ নিজেকে ফেরাউনী, কেউ ব্যবিলনী, কেউ ফিনিশীয়, কেউ পারসী, কেউ তুর্কী ইত্যাদি ভাবে প্রকাশ করে। ফলে তারা গোটা জাতিকে প্রকারান্তরে দ্বীন ইসলাম থেকে আলাদা করে ফেলে। কারও কারও দুঃসাহস এত বেশি যে, নিজেকে কাফের, মুশরিক বা নাস্তিক, মুরতাদ গোত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ করে। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে একটু বলবেন– যুবকসমাজ কাফের মুশরিক বা নাস্তিক মুরতাদ গোত্রের নামে সম্বোধিত ব্যক্তির সাথে কীরূপ আচরণ করবে? যখন সে কুরআনের পাতায় পাতায় ফেরাউন, তার সেনাবাহিনী ও সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশাপ দেখতে পাবে, আবার বাস্তব জীবনে এমন লোকের নামে সম্বোধিত ব্যক্তির গলায় ফুলের মালা দেখতে পাবে! এমতাবস্থায় যুবসমাজের মাঝে বিশৃঙ্খলা ব্যতীত আর কী দেখবেন বলুন? দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাকে আঁকড়ে ধরবে। সে কাকে সত্যবাদী মনে করবে? কার অনুসরণ করবে? বুঝে উঠতে পারবে না।

আজ আমাদের গোটা শিক্ষাব্যবস্থা, স্কুল-কলেজ-মাদরাসা-ভার্সিটি তথা সব শিক্ষাঙ্গন এখলাস ও লিল্লাহিয়াত মুক্ত হয়ে পড়েছে। ছাত্র-উস্তাজের মাঝে মহব্বত-ভালোবাসার সম্পর্ক নেই। বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা আক্রান্ত।

সবকিছুর ওপর দ্বীনকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা আজ নেই বললেই চলে। জিহাদের আয়াতসমূহ যেন আসমানে তুলে নেওয়া হয়েছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন আজ ধুলায় ধূসরিত।

আজ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় কে এমন মনীষী আছেন, যিনি যুবসমাজকে আখেরাতের পথে আহ্বান করবেন? কেয়ামত দিবসে আল্লাহর দরবারে হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা বোঝাবেন? আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে কি আজ এমন খোদাভীরু বুযুর্গ আছেন, যিনি যুবকদের ডেকে বলবেন, আমল পরিশুদ্ধ করো, পড়াশোনার প্রতি মনোনিবেশ করো? কারণ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দেখছেন। তিনি তোমাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী তোমাদের প্রতিদান দিবেন। না কি শিক্ষাঙ্গনগুলো এমন মানুষে ভরপুর, যারা ছাত্রদের বলেন, শুনে রাখো! যারা পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করবে, কাঙ্ক্ষিত মানদণ্ডে নির্বাচিত হবে, তারা দুনিয়ার উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। তার টাকা-পয়সা, ইজ্জত-সম্মান কোনো কিছুর অভাব থাকবে না। অন্যদের থেকে সে অনেক সময় অবসরও কাটাতে পারবে। কারণ, তার গাড়ি থাকবে, বাড়ি থাকবে, বেতন-ভাতা হবে আকর্ষণীয়!!

হে মুসলিম যুবসমাজ, এ দুই শ্রেণির মাঝে কত ব্যবধান! এক শ্রেণি আখেরাতের জন্য কাজ করে, আরেক শ্রেণি পার্থিব স্বার্থে কাজ করে।

এর অর্থ এই নয়, আমরা আমাদের যুবসমাজকে দুনিয়া বর্জনের শিক্ষা দেব বা তাদের উপার্জন-বিমুখ করে গড়ে তুলব। উদ্দেশ্য হলো, নিয়ত বিশুদ্ধ করা ও সঠিক পথে পরিচালিত করা। তাহলে তাদের যাবতীয় কাজকর্ম তথা আলোচনা-পর্যালোচনা, জ্ঞান-বিদ্যা, আখলাক-চরিত্র, মুআমালা-লেনদেন, আমল-ইবাদত, অর্জন-উপার্জন– সবই নেককর্ম হিসেবে গণ্য হবে।

আমরা চাই, শিক্ষকমণ্ডলী ছাত্রদের এই শিক্ষা দেবেন যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাকে সব সময় দেখছেন। তিনি চিরঞ্জীব– কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। চিরস্থায়ী– কখনো বিস্মৃত হবেন না। তিনি সবকিছু জানেন– তার কাছে কোনো কিছু গোপন থাকে না। তাহলে যুবসমাজ সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করবে। তার সন্তুষ্টি কামনা করবে। ভেতর-বাহির সংশোধনের চেষ্টা করবে। অলসতা-অবহেলা ঝেড়ে ফেলে নেক আমলের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে।

ইসলামী তরবিয়ত বা প্রতিপালন ও ইসলামী আদর্শ নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির মাঝে সীমিত নয়। বরং এর ক্ষেত্র হলো গোটা মুসলিম উম্মাহ। এটি রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, ঘর-বাড়ি, স্কুল-মাদরাসা তথা সর্বত্র সবার জন্য পালনীয়। মোটকথা, অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, উম্মতের দরদ

রয়েছে, মর্যাদা ও প্রাপ্তির উচ্চাসনে আরোহণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ এই নয় যে, কেউ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে অন্যরাও অবহেলা করবে।

সুতরাং যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পাঠ্যসূচিকে ইসলামমুক্ত রাখা হয়, তাতে দ্বীনের প্রাণ না থাকে, এটি অভিভাবক ও মুরুব্বিদের জন্য মোটেও কল্যাণকর নয়। অভিভাবক-শ্রেণির প্রতি আমার আকুল আবেদন– সন্তানকে ইসলামের সরল-সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবেন না। বাবা-মা, ভাই-বোন, শিক্ষক-উস্তাজ, পাড়া-প্রতিবেশী তথা অভিভাবকমাত্র সকলের কর্তব্য হলো, অধীনস্থ যুবকদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা, দ্বীন পালনের গুরুত্ব, জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয় ঢেলে দেওয়া। কেবল যৌবনে উপনীত হওয়ার পর তাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে এমন নয়, বরং এরও বহু পূর্ব থেকে জীবনের প্রতিটি স্তরে তাদের অন্তরে এসব বিষয়ের বীজ বপন করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ডান কানে আজান ও বাম কানে ইক্বামত দেওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন! এ কথা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, জন্ম থেকে মৃত্যুপর্যন্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত শিক্ষাক্ষেত্র। গোটা জীবন একটি বিদ্যানিকেতন। মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত করতে হবে। এভাবে সন্তান লালিত-পালিত হলে তাদের জীবন হবে নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ। আমরা জীবনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো অবৈধ কাজ করতে চাইলেও যেন নিজেকে কমপক্ষে একশো বার জিজ্ঞাসা করি যে, এতে আমার দয়াময় স্রষ্টা আল্লাহ কি সন্তুষ্ট থাকবেন না নারাজ হবেন?

সুতরাং এ কথার অজুহাত দেখিয়ে কোনো অভিভাবক ছাড় পাবেন না যে, তাদের সিলেবাসে তো ইসলামী আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হয় না। তাই তাদের সন্তানেরা ইসলামী আদর্শে আদর্শবান হতে পারেনি। অথবা কেউ এই অজুহাতের ছলে দায়িত্বমুক্ত হতে পারবেন না যে, তারা দীর্ঘ এক বছর ব্যয় করে যা অর্জন করে, অন্যরা তা একদিনে ধ্বংস করে দেয়। সন্তানদের ইসলামী আদর্শ শিক্ষা না দেওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো কোনো গ্রহণযোগ্য আপত্তি নয়। আমি স্বীকার করছি, কাজটি অনেক কঠিন; তবে অসম্ভব নয়। আমরা বিশ্বাস করি, যে ব্যক্তি ইখলাসের সাথে চেষ্টা করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অবশ্যই তাকে তৌফিক দান করবেন এবং তার জন্য আত্মশুদ্ধি ও আমলের যাবতীয় দ্বার উন্মোচন করে দেবেন।

এবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। তা হলো, আমি কিন্তু যুবসমাজকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করিনি।

ইসলামের আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়িত করার পথে যত বাধা-বিপত্তি, ঘাত-প্রতিঘাত আসুক না কেন, কেয়ামতের দিন প্রত্যেককেই বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। প্রত্যেককে সেদিন যৌবনকালের হিসাব দিতে হবে। তাই কোনো বিবেকবান যুবকের জন্য বেপরোয়া জীবনযাপন করা উচিত নয়।

এ কথা বললে চলবে না, সবাই তো এমন করে, সুতরাং আমিও একটু করে দেখি। সবাই তো কম-বেশি আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়, সুতরাং আমিও একটু অবাধ্য হই।

আবার এমনও নয় যে, যারা ইসলামবিরোধী জীবনবিধান প্রণয়ন করছে, তারা যুবসমাজের ঈমান-আমলের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। সুতরাং সার্বিক বিষয়টি কঠিন মনে করে সবদিক থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিজে অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। আবার অন্যের অপরাধপ্রবণতায় প্রভাবিত হওয়া থেকেও দূরে থাকতে হবে।

হে যুবক, নিজেকে প্রশ্ন করুন এবং নিজের মাঝে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন। প্রত্যেক যুবকেরই উচিত নিজেকে এমন প্রশ্ন করা। প্রশ্নটি হলো–

আল্লাহ তা'আলা কেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন?

প্রশ্নটি একবার দুইবার তিনবার করুন।

আল্লাহ তা'আলা কেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন?

এটি আপনার জীবনের সাধারণ কোনো বিষয় নয়, বরং এটি আপনার জীবনের চিরস্থায়ী সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয়। এর ওপরই আপনার দুনিয়া-আখেরাতের সফলতা নির্ভরশীল।

অধিকাংশ যুবক নিজেকে এই প্রশ্ন করে না। আর এ কারণেই তারা জীবন ধ্বংস করতে বসে।

নিশ্চয়ই মানব-সৃষ্টির একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. (المؤمنون)

> 'তোমরা কি মনে করো যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি, আর তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না?'[১০]

[১০] সূরা মুমিনুন (২৩): ১১৫

কেন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন?

আল্লাহ তা'আলা কি আমাদেরকে আনন্দ-ফুর্তি ও ভোগ-বিলাসের জন্য সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের ধন-সম্পদ অর্জন করার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের বীরত্ব প্রদর্শন বা মল্লযুদ্ধ করার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

আল্লাহ তা'আলা কি আমাদেরকে তার অবাধ্যতা, বিরোধিতা ও পিঠপ্রদর্শন করার জন্য সৃষ্টি করেছেন?

বিজ্ঞ স্রষ্টার সৃষ্টি এসবের কোনো একটির জন্যও হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ. (الذاريات)

> 'আমি জিন ও মানবজাতিকে আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি।'[১১]

সুতরাং উদ্দেশ্য হাসিল করতে না পারলে এ জীবন তো খেল-তামাশার বস্তু ভিন্ন কিছু নয়। লক্ষ্যহীন জীবনের কোনো মূল্য নেই।

প্রশ্ন হলো, ইবাদতের অর্থ কী? ইবাদত কাকে বলে?

ইবাদতের প্রকৃত অর্থ হলো, আল্লাহর প্রতি নিজের পূর্ণ ভালোবাসা নিবেদন করতঃ পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহর সামনে পূর্ণ নত হওয়া এবং তার প্রতি পূর্ণ ভালোবাসা নিবেদন করার নাম হলো ইবাদত।

আকীদা-বিশ্বাসে, চিহ্ন-নিদর্শনে, আখলাক-চরিত্রে, মুআমালা-মুআশারায় তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যৌবনে-বৃদ্ধকালে, সুস্থতা-অসুস্থতায়, যুদ্ধ-বিগ্রহে, শান্তি-সংঘর্ষে, সফরে-অবস্থানকালে তথা জীবনের প্রতিটি স্তরে নিজেকে আল্লাহর সামনে পূর্ণ সঁপে দেওয়া এবং নিজের সবটুকু ভালোবাসা তাকে নিবেদন করার নামই হলো ইবাদত।

---

[১১] সূরা যারিয়াত (৫১): ৫৬

কিছু সুবিধাবাদী ও অধিকাংশ সাধারণ মুসলমানের ধারণামতে ইবাদত হলো শুধুমাত্র নামায, রোজা, হজ্ব ও যাকাত– বিষয়টি এমন নয়।

আর এখান থেকেই তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির উদয় হয়েছে যে, ইবাদতের উপযুক্ত স্থান কেবল মসজিদ– কখনো কখনো ঘর। আর অবশিষ্ট জীবন তোমার। সেখানে তোমার যা ইচ্ছা করবে। রব্বুল আলামীন যা চান, তা নয়।

বলুন হে যুবসমাজ, এটি কি মেনে নেওয়ার মতো কোনো কথা?

আল্লাহ তা'আলা কি আমাদের এই জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, আমরা আমাদের সময় থেকে কিছু অংশ দ্রুত ইবাদত করে কাটিয়ে দেব। কতিপয় যিকির-আযকার করব। আর বাকি সময় নিজের ইচ্ছে মতো—আল্লাহর ইচ্ছার পরোয়া না করে– কাটিয়ে দেব?

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে বলেন–

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. (الزلزال)

'যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ও সৎকর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলেও সে তা দেখতে পাবে।'[১২]

সুতরাং প্রত্যেকের জীবনের অণু পরিমাণ কর্মেরও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব নেওয়া হবে। ছোট-বড় সবকিছু সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কেয়ামত-দিবসে এই ভয়াবহ হিসাব-নিকাশ দেখে মানুষ বলবে–

مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا. (الكهف)

'এটি কেমন কিতাব (আমলনামা), ছোট বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি। বরং সবকিছু হিসাব করে রেখেছে।'[১৩]

সুতরাং দুনিয়ার প্রতিটি বস্তুর এবং মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে সবিস্তার প্রশ্নোত্তর হবে। এ কারণেই আমি ইবাদতের প্রকৃত অর্থ করেছি, পূর্ণ ভালোবাসা নিয়ে আল্লাহর সামনে নিজেকে পুরোপুরি সমর্পণ করা। যা নিম্নোক্ত আয়াতের আলোকে প্রতিভাত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. (الأنعام)

'(হে নবী, আপনি বলুন, আমার নামায আমার কুরবানী আমার জীবন আমার মৃত্যু (সবই) আল্লাহর জন্যে।'[১৪]

---

[১২] সূরা যিলযাল (৯৯): ৭-৮

[১৩] সূরা কাহাফ (১৮): ৪৯

[১৪] সূরা আন'আম (০৬): ১৬২

অর্থাৎ আমাদের জীবনের সবকিছু আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমাদের প্রতিটি নড়াচড়াও আল্লাহর জন্য। আমৃত্যু এই চেতনা নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। এই অবস্থায় মৃত্যু হলে তা আল্লাহর পথের মৃত্যু বলে বিবেচিত হবে।

এভাবে জীবন কাটালে জীবন হবে আল্লাহর পথে। মৃত্যুও হবে আল্লাহর পথে। সুতরাং আসুন, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আমাদের নামায-রোজা আল্লাহর জন্য, চাকরি-বাকরি আল্লাহর জন্য, বেতন-বোনাস আল্লাহর জন্য, ধন-সম্পত্তি, আয়-উপার্জন, রিযিক-দৌলত আল্লাহর জন্য, বাবা-মা, সন্তান-সন্ততি, ছোট-বড়, ভাই-বোন, ছাত্র-শিক্ষক, চেনা-অচেনা সবার সঙ্গে আমাদের আচরণ হবে আল্লাহর জন্য। আমরা আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসব। আবার ঘৃণা করলেও আল্লাহর জন্য করব। এমনকি আনন্দ-ফুর্তি, আরাম-আয়েশও হবে আল্লাহর জন্য।

এ বিষয়ে অগণিত আয়াত-হাদীস আছে। কারণ, এতে গোটা মানবজীবন ও পূর্ণ দ্বীন ইসলাম নিহিত। এটি এমন এক ব্যাখ্যা, যার মাধ্যমে মানবজাতি মুক্তি পেতে পারে। অন্যথায় ধ্বংসের কালো থাবা থেকে রক্ষা পাওয়া খুব কঠিন।
সুতরাং কেয়ামত দিবসে সবাইকে হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। সবার হিসাব আলাদা আলাদা হবে। কাউকে অন্যের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। আবার আপনার আমল সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. (المدثر)

'প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।'[১৫]

কেয়ামত দিবসে কোনো একজন ব্যক্তিও ভালো-মন্দ কোনো কাজে আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন–

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. (الأنعام)

'তোমরা আমার কাছে আজ একাকী এসেছ, যেভাবে আমি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম।'[১৬]

সুতরাং আপনার জীবনের একটি মুহূর্ত যদি আল্লাহর ধ্যানমগ্নতা ছাড়া অতিবাহিত হয়, সেই মুহূর্তের হিসাব অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে। অন্য কেউ দেবে না। আপনার বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষক-অভিভাবক, কাছের-দূরের

---

[১৫] সূরা মুদ্দাসসির (৭৪): ৩৮
[১৬] সূরা আন'আম (০৬): ৯৪

কেউ আপনার সামান্য বোঝা বহন করবে না। মনে রাখবেন, কিছুতেই এদের কেউ আপনার সামান্য বোঝা বহন করবে না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. (العنكبوت)

‘কাফেররা মুমিনদের বলে, আমাদের পথ অনুসরণ করো, তাহলে আমরা তোমাদের পাপভার বহন করব। কিন্তু তারা তো তাদের পাপভারের কিছুই বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।’[১৭]

ফেতনাবাজ পাপী কাফের মুশরিকরা কখনো তাদের সামান্য বোঝা বহন করবে না। উল্টো তাদের ফেতনায় নিপতিত করবে। অণু পরিমাণ বোঝাও তারা বহন করবে না। প্রত্যেকে নিজ নিজ হিসাব প্রদানে ব্যস্ত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বিবেক-বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। আপনার সামনে কল্যাণ-অকল্যাণের পথ খুলে দিয়েছেন। হেদায়েত ও গোমরাহীর পথ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. (البلد)

‘আমি তাকে দুটি পথ দেখিয়েছি।’[১৮]

দুটি পথ তথা ভালো-মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের পথ।

হে মুসলিম যুবসমাজ, আমি যে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি বলার ইচ্ছা করেছিলাম, তা এখানেই শেষ।

একটু ভেবে দেখুন, আপনার যৌবনের বছরগুলো যদি এভাবে শেষ হয়ে যায়, আপনি আল্লাহর পথ থেকে দূরেই সরে থাকেন, অপরাধকর্মে ডুবে থাকেন, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় বেপরোয়া জীবন কাটান, জীবনের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকে, এভাবে যদি যৌবন শেষ হয়ে যায়, এরপর আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনেন, তাহলে আপনার জীবনের হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণোজ্জ্বল যৌবনকাল কে ফিরিয়ে দেবে?

আপনার জীবনের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধজীবন বা কম বেশি হারিয়ে যাওয়া অতীতকে ফিরিয়ে দেবে?

এটা তো আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, অতীত কখনো ফিরে আসে না।

---

[১৭] সূরা আনকাবুত (২৯): ১২
[১৮] সূরা বালাদ (৯০): ১০

তাহলে কেন আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাবেন না? কেন আপনার অস্তিত্বের প্রতিটি সেকেন্ডকে কর্মময় করে তুলবেন না?!

হযরত হাকেম রহ. তার *সহীহ* গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. (رواه الحاكم)

'পাঁচটি বস্তুর অস্তিত্বকে পাঁচটি বস্তুতে হারিয়ে যাওয়ার পূর্বে গনিমত মনে করবে—

১. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে
২. রোগ-শোকের পূর্বে সুস্থতাকে
৩. দারিদ্র্যের পূর্বে সচ্ছলতাকে
৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং
৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।'[১৯]

সমৃদ্ধ অর্থবহ চমৎকার একটি হাদীস। হাদীসের পরিভাষায় এটি 'জাওয়ামিউল কালিম' [শব্দ কম অর্থ বেশি]-এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের সকলেরই হাদীসটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।

অনেক সময় মানুষ প্রকৃত বিষয় বুঝে উঠতে পারে না। ফলে জীবনের মূল লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে। শেষ মুহূর্তে যখন আফসোস আর আক্ষেপের কোনো অন্ত থাকে না, দেয়ালে হাত চাপড়েও কোনো লাভ হয় না, তখন বুঝে আসে। চল্লিশ বা পঞ্চাশ উর্ধ্ব বয়সে যৌবনের মূল্য বুঝতে পারে।

অসুস্থ ব্যক্তি তখনই সুস্থতার মর্ম উপলব্ধি করতে পারে, যখন বিছানা তার সঙ্গী হয়।

ধনী ব্যক্তি সম্পদ হারিয়ে ফেললে কিংবা দরিদ্র হয়ে পড়লে সম্পদের মূল্য বুঝতে পারে।

ধীরে ধীরে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যেতে যেতে মানুষ যখন জীবন হারাতে বসে তখন সময়ের মূল্য বুঝতে পারে।

[১৯] *হাকেম* : ৭৮৪৬

সবশেষে মানুষ জীবনের মূল্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য তখনই বুঝতে পারে, যখন সে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বা কবরে প্রশ্নোত্তরের মুখোমুখি হয়!!

হে আমার যুবক যুবতী ভাই বোনেরা,

যৌবন হারিয়ে গেলে কে আপনাদের তা ফিরিয়ে দেবে?

আর মৃত্যু তো হঠাৎ যেকোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারে। মৃত্যু কাউকে ছাড়বে না। বয়োবৃদ্ধ মারা যাবে, অনুরূপ টগবগে যুবকও মারা যাবে। অসুস্থ ব্যক্তি মারা যাবে, অনুরূপ সুস্থ ব্যক্তিও মারা যাবে। মৃত্যুর হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। তখন লজ্জা ও অনুশোচনা করে কোনো লাভ হবে না।

হে মুসলিম যুবসমাজ,

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত আহ্বানকে মনে রেখো–

اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ. (الشورى)

'আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই দিবস আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহবানে সাড়া দাও, যা অপ্রতিরোধ্য। যেদিন তোমাদের কোনো আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের জন্য তা প্রতিরোধ করারও কেউ থাকবে না।'[২০]

কারণ : ২

যোগ্য আদর্শবান ব্যক্তির অভাব

বর্তমান মুসলিম যুবসমাজ দ্বিতীয় যে ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি, তা হলো, যোগ্য আদর্শবান ব্যক্তির অভাব। আদর্শবান ব্যক্তির যোগ্য-প্রতিপালন হাজার বয়ান ও উপদেশ প্রদানের চেয়ে বহু গুণে উত্তম ও কার্যকর। হাজার জন মিলে একজনকে উপদেশ প্রদানের চেয়ে হাজার মানুষের কল্যাণে একজনের কাজ করে যাওয়া উত্তম।

[২০] সূরা শুরা (৪২): ৪৭

যে অভিভাবকের কথা ও কাজ তার বক্তব্য ও উপদেশের বিপরীত হয়, তার প্রতিপালন ও পরিচর্যা উপকারের পরিবর্তে অপকার বয়ে আনে– যদিও তার ধারণামতে সে অভিভাবকত্ব করছে। যদিও তার বক্তব্য বিনির্মাণ ও সংস্কারমূলক হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون. (الصف)

'তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।'[২১]

বাবার পক্ষে কি সম্ভব সন্তানকে ধুমপানে বারণ করা, যদি তার নিজ হাত সিগারেটমুক্ত না হয়? এমন বাবা কীভাবে সন্তানকে প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণের নির্দেশ দেবে, যদি সে নিজেই তার প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকে? নিজের মুখ হেফাজতে না থাকলে কীভাবে সন্তানকে জিহ্বা হেফাজতের নির্দেশ দেবে? নিজে সহনশীল না হয়ে সর্বদা রাগান্বিত থাকলে সন্তানকে কীভাবে সহনশীলতার উপদেশ দেবে? সন্তানকে দানশীল হওয়ার উপদেশ দেওয়া বাবার পক্ষে তখনই মানায়, যখন সে কার্পণ্য ত্যাগ করবে।

শিক্ষক কীভাবে ছাত্রদের রহমত ও দয়ার শিক্ষা দেবেন, যদি তিনি নিজে ক্লাসের যথাযথ হক আদায় না করে প্রাইভেট ও কোচিং-এর মাধ্যমে ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা লুফে নেন! এমন শিক্ষক কীভাবে নির্মোহ থাকা ও আমানতদার হওয়ার শিক্ষা দেবেন? যিনি নিজে ক্লাসের হক আদায় করেন না; বরং ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকেন বা ঘুমিয়ে থাকেন!!

কোনো প্রশাসন বা নিরাপত্তাবাহিনীর পক্ষে যুবসমাজকে কোমলতা শিক্ষা দেওয়া কিংবা সন্ত্রাস ও জঙ্গি-তৎপরতা থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়, যদি খোদ প্রশাসন কিংবা নিরাপত্তাবাহিনী দুর্নীতিমুক্ত না হয়।

সুতরাং আদর্শবান ব্যক্তি ব্যতীত তরবিয়ত ও প্রতিপালন কীভাবে সম্ভব বলুন?!

আজ মুসলিম যুবসমাজ অধিকাংশ স্থানে আদর্শবান ব্যক্তির অভাবে ভুগছে। আজ যুবসমাজ কাকে আদর্শব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে? কে সেই যোগ্য আদর্শবান নেতা?

আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি এবং আপন সন্তান, আপন ভাই– এমনকি নিজের জন্য অনুসরণীয় ব্যক্তি নির্বাচন করি। কে আপনার, আপনার সন্তানের আদর্শ?!

[২১] সূরা সফ (৬১): ৩

কেনো বেশিরভাগ যুবক অশ্লীল গায়কদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে? যারা পুরুষদের চেয়ে মহিলাদের সাথে বেশি ওঠাবসা করে।

কেউ কেউ তো আবার খেলোয়াড়দের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, যারা নিজেদের জীবন-যৌবন খেল তামাশার পেছনে কাটিয়ে দেয়। তা ছাড়া অধিকাংশ আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় অমুসলিম হয়ে থাকে। এরা মুসলিম যুবসমাজের স্বপ্নের মানুষে পরিণত হয়– বড়ই হাস্যকর বিষয়! ভাবতে অবাক লাগে, আজ মুসলিম যুবসমাজ খেলোয়াড় হওয়ার নেশায় মত্ত।

কেউ কেউ তো ধনাঢ্যবান ব্যক্তিদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, যারা দেশ-জাতির অর্থ-সম্পদ লুট করে ধনকুবের হয়েছে, অথবা ঘুষখোরদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে, যারা জাতির কাঁধে ছুরি রেখে সমাজসেবক সেজেছে।

কেউ কেউ তো মার্ক্সবাদী অথবা নাস্তিক কিংবা অশ্লীল সাহিত্যিকদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। কেউ আবার শীয়া, ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু তথা অমুসলিমদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু আফসোস আর আক্ষেপের বিষয় হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে এমন মুসলিম-সন্তানের সংখ্যা খুবই কম! অথচ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে পরিষ্কার বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. (الأحزاب)

> 'তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ।'[২২]

আমাদের প্রত্যেকের উচিত, মুসলিম-যুবকদের স্পষ্ট ভাষায় এই প্রশ্ন করা, তোমার আদর্শ কে? তুমি কাকে অনুসরণ করো?

হে সমাজের অভিভাবকবৃন্দ, হে সমাজের কাণ্ডারিগণ, হে শিক্ষকবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করুন। ক্লাসরুমে, লাইব্রেরিতে, রাস্তা-ঘাটে, কফি হাউজে, ক্যান্টিনে যে সকল ছাত্রকে পাবেন, তাদের জিজ্ঞাসা করুন, কে তোমাদের আদর্শ? কাকে তোমরা অনুসরণ করো?

আল্লাহর শপথ! তাহলেই আমরা দেখতে পাব, আমাদের যুবসমাজের ক'জন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে?

---

[২২] সূরা আহযাব (৩৩): ২১

আমাদের ক'জন যুবক যুবাইর, তলহা, সা'দ বা আরকাম রা. কে অনুসরণ করে? আর কতজন গায়ক, খেলোয়াড় ও সাহিত্যিকদের আদর্শ মানে!!

এই পরিসংখ্যানের মাধ্যমে আমাদের সামনে সমাজের প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠবে।

যে যুবক রাস্তার পাশ দিয়ে বেগানা মেয়ের হাত ধরে হাঁটে, তার পক্ষে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, আমার আদর্শ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!?

সিগারেট হাতে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকের পক্ষে বুক টান করে এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, আমার আদর্শ জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আমরা কি আমাদের সন্তানদের স্বপ্নের মানুষদের কথা ভেবে দেখেছি? ভেবে দেখেছি, তারা কাদের অনুসরণ করে? আর কাকে বা কাদের অনুসরণ করা দরকার ছিল?

আমি যুবক ভাইদের নির্দোষ বলছি না। তাদের দায়িত্বমুক্তও মনে করছি না। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে নেই বলে তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না- এমন নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষণ করেছেন। পাশাপাশি দ্বীনের এমন অসংখ্য দায়ী ও খাদেম সৃষ্টি করেছেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনচরিত আমাদের সামনে বর্ণনা করেন। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কর্মপন্থা, পছন্দ-অপছন্দ, তথা গোটা-জীবনকে আমাদের সামনে কাজে-কর্মে, লিখনী-বক্তৃতায় ফুটিয়ে তোলেন। হ্যাঁ! অনেক সময় তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না বটে, তবে তারা নিজেদের পার্থিব-স্বার্থ ত্যাগ করে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে গোটা দুনিয়ায়, পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, শহরে-বন্দরে, মসজিদে-মাদরাসায়, সভা-সেমিনারে তথা সর্বত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত আলোচনা করেন। শুধু প্রয়োজন হলো, তাদের কাছ থেকে যুবসমাজের শিক্ষা গ্রহণ করা।

বর্তমানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে না পারার কোনো কারণ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহ সাহাবায়ে কেরামের জীবনাদর্শ সম্পর্কে অবগতি লাভ করা খুবই সহজ। বইপত্র, অডিও-রেকর্ডিং, কম্পিউটার-ইন্টারনেট তথা আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি তা আরও সহজ করে দিয়েছে। ইলমী বৈঠকের সংখ্যাও কম নয়। এখন ওলামা-মাশায়েখের সান্নিধ্যে যাওয়াও খুব সহজ। কাজটা প্রথম পর্যায়ে কঠিন হলেও শুরু করুন, দেখবেন, মুষলধারে বরকত নাযিল শুরু হবে।

ইসলামের ইতিহাস নেক-সৎ-যোগ্য-আদর্শবান অনুসরণীয় ব্যক্তিত্বে ভরপুর, শুধু কাঙ্ক্ষিত মহামানবকে ইতিহাসের হাজার হাজার পৃষ্ঠা থেকে খুঁজে বের করে নিতে হবে।

অনুরূপ বর্তমান পৃথিবীও এমন মহান ব্যক্তিত্ব থেকে শূন্য নয়, যারা বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতিতেও জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে আছেন। যাদের মাঝে রয়েছে মুসলিম যুবসমাজের জন্য উত্তম আদর্শ। তারা শুধু শহর বা নগরে নন; বরং তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন পৃথিবীর সর্বত্র। আল্লাহ তা'আলার অশেষ অনুগ্রহে তাদের সংখ্যা অনেক। সীমিত কিছু বিষয়ে তারা অনুসরণীয় তা নয়, বরং দাওয়াত ও তাবলীগ, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশলবিদ্যা, গণিত, রসায়ন, কৃষিশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি তথা জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ছোট-বড়, পুরুষ-মহিলা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলের জন্য অনুসরণীয়।

যোগ্য আদর্শ– যারা শত বিপদেও দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে থাকেন, আল্লাহর বিধানের খেলাফ করেন না– ইসলাম কখনো এমন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব থেকে শূন্য হবে না। মুসলিম উম্মাহর মাঝ থেকে কখনো কল্যাণ নিঃশেষ হয়ে যাবে না। কেয়ামত অবধি এমন মহামানব মুসলিম জাতির মাঝে উপস্থিত থাকবেন। তবে তাদের খুঁজে পাওয়ার জন্য শর্ত হলো, সঠিক স্থানে সঠিক পন্থায় তাদের অনুসন্ধান করা।

যাকে আপনি নিজের আদর্শ মানবেন, তার সামাজিক অবস্থান, পদ-পদবি, আর্থিক সচ্ছলতা, প্রসিদ্ধি থাকা জরুরি নয়; বরং দেখতে হবে ঈমান-আমল, আখলাক-চরিত্র, দ্বীনদারিতে তিনি উচ্চ স্তরের কি না?

আমরা এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা করলাম তথা **'প্রত্যেক যুবকের জন্য একজন মুরুব্বি আবশ্যক'** এটি যুবকসমাজের জন্য প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় নয়, বরং এটি তাদের জীবনকে সুন্দরতম ও স্বর্গীয় করার জন্য একটি মৌলিক ও বুনিয়াদি বিষয়।

এ পর্যন্ত আমরা যে সকল সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী মহামনীষীদের আলোচনা করেছি, তারা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। ফলে কথা-বার্তা, চাল-চলন, কাজ-কর্ম তথা জীবনের প্রতিটি বিষয়ে তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ অনুসন্ধান করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশেষ আদর্শ। এ ছাড়াও সকলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত নিজ যুগের আরো একজন মহামনীষীকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ

করেছিলেন, যারা উন্নতি-অগ্রগতির পথে তাদের সহযোগী ছিলেন। যেমন হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. কে দেখাশুনা করেছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রা.। আর যায়েদ ইবনে হারেসা রা. কে প্রতিপালন করেছিলেন হযরত আননাওয়ার বিনতে মালেক রা.। হযরত মু'আয ইবনে আমর ইবনে জামুহ রা.-এর মুরুব্বি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবী আমর ইবনে জামুহ রা.। এভাবেই এ সকল মহামনীষী নিজ যুগের একজন মুরুব্বির বিশেষ যত্নে বেড়ে উঠেছিলেন। যারা তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পথে সহযোগী ছিলেন। এই হলো তাদের জীবনের সফলতার রাজপথ– বর্তমানেও এর বিকল্প নেই।

সুতরাং হে মুসলিম যুবসমাজ, কোনো চিন্তা-ভাবনা, যাচাই-বাছাই ছাড়াই যেকোনো মুরুব্বির পিছনে দৌড়াবেন না। কারণ, আপনার মুরুব্বি কেবল আপনার দুনিয়ার ভাগ্য নির্ধারক নন, আখেরাতেরও ভাগ্য নির্ধারক। এমনকি দুনিয়ার চেয়ে আখেরাত বিষয়ে মুরুব্বির প্রভাব বেশি কার্যকর হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

কারণ : ৩

হতাশা

বর্তমান মুসলিম যুবসমাজের অবনতি ও অধঃপতনের নেপথ্যে 'হতাশা' অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমান যুবসমাজের সর্বত্র একটি হতাশা বাক্য ছড়িয়ে পড়েছে– 'আর সম্ভব নয়'। তবে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে কখনো হতাশ হতে নেই। অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে সম্মানিত করবেন এবং এ জাতির জন্য আল্লাহ তা'আলা যেই দ্বীন মনোনীত করেছেন, তা অবশ্যই এ ধরায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু যুবসমাজ অল্পতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। সাময়িক ব্যর্থতায় ভেঙে পড়ে। তাদের হতাশা আর ব্যর্থতার পেছনে একটা বড় যৌক্তিক কারণও আছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে একটানা মুসলিমজাতির অধঃপতন ও পরাজয় দেখে আসছে। বিপরীতে অমুসলিমদের অগ্রগতি ও বিজয়োল্লাস দেখে নিজেদের বিজয়গাথার সোনালি ইতিহাস ভুলতে বসেছে। ফলে হতাশা আর বঞ্চনাই বাস্তবতা হিসেবে তাদের সামনে ধরা দিয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক- এমনকি শিক্ষা ও চারিত্রিক ক্ষেত্রেও হতাশা নেমে এসেছে।

উপরন্তু প্রাচ্য ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যকার দূরত্ব যুবসমাজের হতাশাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং দিনে দিনে এই দূরত্ব বেড়েই চলেছে। কারণ, পশ্চিমারা ইসলামের সোনালি ইতিহাসকে শুধু বিকৃত করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং তা ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে হরহামেশা। ফলে আজ মুসলিম যুবসমাজ কেবলই অধঃপতন, ফেতনা, পরাজয় ও বিপদাপদের ঘটনাবলী দেখছে। এতে তারা আরও বেশি ভেঙে পড়ছে।

তা ছাড়া মুসলিমবিশ্বের অবিরাম অধঃপতন যুবসমাজের হতাশাকে আরও গভীর করেছে। শুধু ফিলিস্তিন নয়, বরং ইরাক আফগানিস্তান, চেচনিয়া, কাশ্মীর, তুর্কিস্তান ও সুদান ইত্যাদি মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর পতনের গল্প যুবসমাজকে নেতিয়ে দিয়েছে।

পাশাপাশি মুসলিম দেশগুলোর স্বৈরাচারী-রাজনীতি, প্রশাসনিক-দুর্নীতি, অকার্যকর গণতন্ত্র, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিপর্যয়, সুদ, ঘুষ, স্বজনপ্রীতি, মিথ্যা ও খেয়ানত ইত্যাদি কারণে এক হতাশ যুবসমাজ সৃষ্টি হয়েছে।

এই হতাশাজনক পথ থেকে উত্তরণের উপায় কী?!

এ জাতির কল্যাণকামী হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক বাবা-মা, শিক্ষক ও অভিভাবকের উচিত এ কথা খুব ভালোভাবে মনে রাখা যে, **কোন জাতির সফলতা ও কামিয়াবী কখনো হতাশ ও নিরাশ প্রজন্মের হাতে রচিত হয় না।**

হতাশ জাতি কখনো পা সোজা করে দাঁড়াতে পারে না।

এ এক স্বীকৃত বিধান, কখনো অস্বীকার করা যায় না।

তাই যুবসমাজের উচিত, অন্তরে আশার বীজ বপন করা।

হতাশা ও নিরাশা কিছুতেই মুমিনের গুণ হতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. (الحجر)

'হযরত ইবরাহীম আ. ফেরেশতাদের বললেন, পথভ্রষ্ট ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়?'[২৩]

যত বিপদ আসুক, যতই দুর্যোগ ঘনীভূত হোক, কিছুতেই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে নেই।

---

[২৩] সূরা হিজর (১৫): ৫৬

হে মুসলিম যুবসমাজ, একটি কথা।
আপনাদের প্রতি আমার হৃদয়-নিংড়ানো উপদেশ...
যখন অবলা নারীদের আর্তনাদ শুনবেন...
মায়েরা একের পর এক সন্তান হারাবে...
যখন সকাল-সন্ধ্যা নির্মমভাবে শিশু-হত্যা দেখবেন...
মুজাহিদদের বিতাড়িত ও বন্দী হতে দেখবেন...
যখন ঘর-বাড়ি ভস্ম হতে দেখবেন...
যখন কোন অঞ্চল বিরান হতে দেখবেন...
খেত-খামার জ্বালিয়ে দিতে দেখবেন...
মৃতলাশের কবর দেওয়ার জায়গা খুঁজে পাবেন না...

চারদিকে কেবল জুলুম-অত্যাচার, ধ্বংস আর হত্যার মিছিল শুনতে পাবেন...

যখন দুর্বলদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হবে...

এ ছাড়াও আরও অযাচিত ঘটনা ঘটতে দেখবেন...

তখনও হতাশ হবেন না। বসে থাকবেন না। দুর্বল হবেন না। নিরাশ হবেন না। কারণ–

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. (يوسف)

> 'আল্লাহর রহমত থেকে কাফের শ্রেণি ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না।'[২৪]

বন্ধুরা, প্রকৃত অবস্থা বোঝার চেষ্টা করুন।

মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলার কিছু নীতিমালা রয়েছে, যেগুলোর কখনো পরিবর্তন-পরিমার্জন হয় না।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ.

> 'যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো তাদেরও লেগেছিল। আমি পর্যায়ক্রমে মানুষের মধ্যে এই দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই।'[২৫]

আজ যেমন মুসলমানরা কষ্ট সহ্য করছে, একদিন অন্যরাও কষ্ট সহ্য করেছিল। সেদিন মুসলমানরা নিরাপদে–শান্তিতে ছিল। আবার একটা সময় আসবে যখন

---

[২৪] সূরা ইউসুফ (১২): ৮৭
[২৫] সূরা আল ইমরান (০৩): ১৪০

নিঃসন্দেহে মুসলমানদের সাম্রাজ্য–শক্তি ফিরে আসবে।

মনে রাখবেন, মুসলিম জাতি অন্যান্য জাতির মতো নয়। মুসলিম জাতি বিশেষ গুণে গুণান্বিত। বিশেষ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। মুসলিম জাতি কখনো চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে না। হয়তো কালের বিবর্তনে কখনো দুর্বল হয়ে পড়বে। কিন্তু চিরদিনের জন্য কখনো নিঃশেষ হবে না। এ জাতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শেষ বাণীটি পৃথিবীবাসীর কাছে পৌঁছে দেবে।

বলুন, মুসলিম জাতি ধ্বংস হলে কোন জাতি পৃথিবীর বুকে আল্লাহর বিধান কায়েম করবে?

বিশ্ববাসীর কল্যাণেই আল্লাহ তা'আলা এই জাতিকে টিকিয়ে রাখবেন।

মুসলিম জাতির অস্তিত্ব গোটা বিশ্বের জন্য কল্যাণকর। আর মুসলিম জাতির বিদায় বিশ্ববাসীর ধ্বংসের কারণ।

মনে রাখবেন, যুদ্ধের ঘোষণা মূলতঃ একদল মুসলমান আর একদল কাফেরের মাঝে নয়, বরং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের ঘোষণা হলো, আল্লাহ তা'আলা ও দ্বীন শরীয়তবিরোধী দুর্বল বান্দাদের মধ্যে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. (آل عمران)

'তারা চক্রান্ত করে আর আল্লাহ তা'আলা কৌশল অবলম্বন করেন। আল্লাহ তা'আলা কৌশল অবলম্বনকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'[২৬]

আল্লাহর যুদ্ধ বড় কঠিন। আল্লাহর যুদ্ধ হবে তার শক্তি, পরাক্রমশীলতা, ক্ষমতা ও অহংকার অনুযায়ী।

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. (الزمر)

'তারা আল্লাহ তা'লার ক্ষমতাকে যথাযথ অনুধাবন করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূমণ্ডল তার কব্জায় থাকবে ও আকাশমণ্ডলী ভাঁজ করা অবস্থায় তার হাতে থাকবে। পবিত্র ও সুমহান তিনি, তারা তার সাথে যা শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।'[২৭]

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সুসংবাদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনের চেষ্টা করুন।

---

[২৬] সূরা আল ইমরান (০৩): ৫৪
[২৭] সূরা যুমার (৩৯): ৬৭

দেখুন আল্লাহ রব্বুল আলামীন ওয়াদা করে বলেছেন–

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ. (الروم)

'মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।'[২৮]

এ জাতীয় সুসংবাদ সম্বলিত আয়াতসমূহ বোঝার চেষ্টা করুন।

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত ছাওবান রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَأَرِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا. (رواه مسلم)

'আল্লাহ তা'আলা যমিনকে আমার সামনে ভাঁজ করে পেশ করেছেন। আমি পশ্চিম থেকে পূর্ব গোটা বিশ্বকে দেখেছি। নিশ্চয়ই আমার উম্মতের রাজত্ব সে পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, যে পর্যন্ত যমিন ভাঁজ করা হয়েছিল।'[২৯]

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস দেখুন, তারা কখনো হেরে গেলে আবার বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। কখনো পতনের শিকার হলে আবার উত্থানের পথ নির্মাণ করেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর ধর্মত্যাগের ফিতনার সময় আমাদের অধঃপতন আজকের অধঃপতনের চেয়ে আরও ভয়াবহ ছিল। আমরা আবার পরিখা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছি। নতুনভাবে আবার ইতিহাস রচনা করেছি। এমনকি রোম-পারস্য দুই মহাশক্তিকে পরাভূত করেছি।

ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় ক্রুসেড বাহিনীর কাছে আমারা তিক্ত পরাজয় বরণ করেছিলাম। আবার আমরা মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছি। আবির্ভূত হয়েছেন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী, নূরুদ্দীন মাহমুদ, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী। আমরা আবার নতুন সাজে সজ্জিত হয়েছি। ইসলামের পতাকাকে আমরা নতুনভাবে উড্ডীন হতে দেখেছি।

স্পেনে আমরা পরাজিত হতে না-হতেই আমরা অটোমান মুজাহিদদের পতাকাতলে এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা কনস্টান্টিনোপল জয় করেছি।

হে মুসলিম যুবসমাজ, প্রত্যেক পরাজয়ের পর আমাদের ঘুরে দাঁড়াবার ইতিহাস আছে। সুতরাং নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিরাশ হবেন না।

---

[২৮] সূরা রূম (৩০): ৪৭

[২৯] *মুসলিম* : ২৮৯১

কারণ : ৪

তথ্যপ্রযুক্তি ও অশুভ গণমাধ্যম

তথ্যপ্রযুক্তির বর্তমান এ যুগ অনেক গুরুতর। যদি জাতির মানসিকতা পরিবর্তনের দুটি দিক থেকে থাকে, তাহলে তার একটি হলো ইসলামী প্রতিপালন। আর দ্বিতীয়টি হলো তথ্যপ্রযুক্তি ও গণমাধ্যম।

তথ্যপ্রযুক্তি সরাসরি জাতির দুয়ারে বার্তা পৌঁছে দেয়। বিশেষত যুবসমাজ এর মাধ্যমে খুব বেশি প্রভাবিত হয়। আমি পশ্চিমা বা দূর প্রাচ্যের তথ্যপ্রযুক্তির কথা বলছি না। আমি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর তথ্যপ্রযুক্তির কথা বলছি।

আহ, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর তথ্যপ্রযুক্তির কী দুরবস্থা!!

মুসলিম দেশগুলোতে অঢেল অর্থ-সম্পদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, বেহায়াপনা-অশ্লীলতা ও চরিত্র-বিধ্বংসী কাজে ব্যয় করা হয়।

একদল মানুষ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও মুসলিম যুবসমাজের চরিত্র বিনষ্টকরণের পেছনে অঢেল সম্পদ ব্যয় করছে। এদের কারণে আজ টেলিভিশন, ভিডিও ক্লিপ, চলচ্চিত্র ইত্যাদি ঈমানবিধ্বংসী বস্তুর আবিষ্কার হয়েছে। যা একসময় আমরা কল্পনাও করতে পারতাম না যে, আমাদের মাঝে এগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটবে। সিনেমা, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট তো দূরের কথা।

আরেক দল মানুষ ইসলাম, মুসলমান ও ধর্মপ্রিয় মানুষদের নিয়ে ঠাট্টা-উপহাসে লিপ্ত। তারা মজবুতভাবে দ্বীন পালনকারীদের সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসী ও জঙ্গি হিসেবে প্রচার করে। তারা বিশ্ববাসীর সামনে মুসলমানদেরকে জঙ্গি হিসেবে পরিচিত করে সবাইকে আতঙ্কিত করে রাখে– ফলে মুসলিম নাম শুনলেই অনেকে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

তৃতীয় আরেক দল ইসলামকে স্বচ্ছ শান্তির ধর্ম হিসেবে চিত্রায়িত করতে গিয়ে এ কথা বোঝায় যে, ইসলামে যুদ্ধ-জিহাদ প্রতিবাদ বলতে কিছুই নেই। যেন মুসলমানদের কোনো আত্মমর্যাদা নেই, তাদের সম্মানহানি হলে, অধিকার ক্ষুণ্ণ হলেও যেন তারা চুপচাপ নীরবতা পালন করবে।

চতুর্থ আরেকদল ইসলামের সোনালি ইতিহাসকে বিকৃত করে জাতির সামনে উপস্থাপন করে। তারা বলে, ইসলাম কেবল বিপদাপদ ও কষ্ট-ক্লেশের ধর্ম। মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা নেই, যা নিয়ে মুসলমানরা গর্ব করতে পারে। তারা কোনো মুসলমানের প্রশংসা করতে চাইলে একদিকে

প্রশংসা করে, অন্যদিকে নিন্দা করে। রাজাকে সম্মান করলে প্রজাদের কষ্ট দেয়।

আরেকদল লোক মুসলিম নেতার সকল কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে। আর ভেতরে ভেতরে যথাসাধ্য (বরং সাধ্যাতীত) নেফাকী করে। যাতে নেতা স্বস্থানে নিজেকে সঠিক জ্ঞান করে। আর প্রজা-সাধারণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখে।

এমন অসংখ্য চক্রান্তের কথা আপনি সংবাদ-মাধ্যমগুলোতে হরহামেশা দেখতে পাবেন। এদের সবার ইচ্ছা এক ও অভিন্ন– যেকোনো উপায়ে ইসলামকে ধ্বংস করা। যুবসমাজকে ইসলামবিদ্বেষী করে গড়ে তোলা। তাদের অন্তরে হতাশার বাণী নিক্ষেপ করা। যুবসমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলা। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!!

তবে ইসলামবিদ্বেষীদের শত চক্রান্ত সত্ত্বেও তাদের ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। যুবসমাজ ও অভিভাবকমণ্ডলীকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই ষড়যন্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত, এমনকি জন্মের বহু পূর্ব থেকে আজ অবধি তারা ইসলাম ও মুসলিম মহামনীষীদের বিরুদ্ধে নানারকম অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামকে কলুষিত করার প্রয়াস চালিয়েছে। তদুপরি এ সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলিম যুবসমাজ যুগে যুগে সফল মোকাবেলা করেছে। তারা এদের ষড়যন্ত্রে প্রভাবিত হয়নি বরং উল্টো তাদের ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দেওয়ার জন্য প্রচারণা চালিয়েছে। মুসলিম জনসংখ্যার তুলনায় যদিও তারা সংখ্যায় খুবই নগণ্য।

যদি এ সকল ফেতনা ও অপপ্রচার ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য পরীক্ষা হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা জানেন, কারা এই ফেতনায় নিপতিত হয়ে ধ্বংস হবে, আর কারা এর সফল প্রতিবাদ করবে।

যুবসমাজের উচিত, আল্লাহ ও তার কিতাব কুরআনকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরা এবং যাবতীয় ঈমানবিধ্বংসী বিষয়াদি পরিত্যাগ করা। পারলে এগুলোর বিরোধিতা করা। আমি বলছি না, তথ্যপ্রযুক্তিকে পরিত্যাগ করতে হবে। বলছি, এর ক্ষতিকারক দিক থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে। আমাদের কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। প্রযুক্তির মোকাবেলা প্রযুক্তি দিয়ে করতে হবে। এসএমএস, মেইল ব্যবহারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সংবাদপত্র প্রকাশেও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। ইন্টারনেট যদি কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহলে কোনো বাধা নেই। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক ব্যাংক পরিচালনা করা সম্ভব হলে তাতে কোনো

সমস্যা নেই। তবে সাবধান যেন ঈমান-আমলের কোনো ক্ষতি না হয়!! আর হ্যাঁ এসবের কারণে কেউ যেন দুনিয়ালোভী না হয়, সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার।

শুধু এভাবেই নয়, বিধর্মী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা আরও অনেক উপায়ে করা যেতে পারে। তবে এ কথা বাস্তব, এসবের পেছনে পড়ে কেউ যদি বিপথগামী হয়, তাহলে কেয়ামতের দিন এই বলে রেহাই পাবে না যে, গুনাহ খুব সহজ ছিল, তাই করে ফেলেছি।

হে মুসলিম যুবসমাজ, উল্লিখিত চারটি কারণে আজ যুবসমাজ বিপথগামী–

১. ইসলামী প্রতিপালননীতি বর্জন

২. যোগ্য আদর্শবান ব্যক্তির অভাব

৩. হতাশা

৪. তথ্যপ্রযুক্তি ও অশুভ মিডিয়া।

এই চারটি কারণে আজ যুবসমাজ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। তবে এতকিছুর পরও যদি মুসলমানরা আল্লাহকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরে তাহলে এগুলো তাদের মাঝে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে না।

إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا. (الحج)

'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের রক্ষা করেন।'[৩০]

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলিম যুবসমাজকে সৎপথে চলার এবং সর্বদা কল্যাণকর কাজের তৌফিক দান করুন। আমীন।

---

[৩০] সূরা হজ্ব (২২): ৩৮

হৃদয়-নিংড়ানো উপদেশ

হে মুসলমান যুবক-যুবতী ভাই ও বোনেরা,

যদি আপনাদের মাঝে দুনিয়া-আখেরাতে সফল হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে থাকে, তাহলে এই আগ্রহকে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত করতে হবে। এরপর অবিরাম কাজ করে যেতে হবে।

সফলতার পথ এত মসৃণ নয়। এ পথ তারই জন্য মসৃণ, আল্লাহ তা'আলা যার জন্য মসৃণ করে দেন। এ পথ তারই জন্য সহজ, আল্লাহ তা'আলা যার জন্য সহজ করে দেন। আল্লাহ তা'আলা সবার অন্তরের খবর রাখেন। তিনি জানেন, কারা ফেতনাবাজ, আর কারা কল্যাণকামী। আল্লাহ তা'আলা সূরা গাফেরে বলেন–

يَعْلَم خَائِنَة الْأَعْيُن وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ. (الغافر)

'তিনি চোখের খেয়ানত ও অন্তর যা গোপন করে, তাও জানেন।'[৩১]

যদি আপনারা সত্যিকার অর্থে এ জাতির উন্নতি চান, তাদের হারিয়ে যাওয়া গৌরব যদি ফিরিয়ে আনতে চান, যদি লাঞ্ছনা আর অবমাননাকর জীবনের ইতি ঘটাতে চান, তাহলে এখন থেকেই শুরু করুন।

আর দেরি নয়। আর কালক্ষেপণ নয়। এখনই সময়। সব বাধা পেরিয়ে আপনাদেরই আগামীর সুন্দর সফল ভবিষ্যৎ গড়ার শপথ করতে হবে। শুরু করুন। আল্লাহ তা'আলা রহমতের দ্বার খুলে দেবেন– ইনশাআল্লাহ।

এখন আমি আপনাদের অতি সংক্ষেপে দশটি উপদেশ প্রদান করব। প্রত্যেকটি উপদেশ এক একটি কিতাব হতে পারে। এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। বক্ষমাণ কিতাবটি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার উপযুক্ত স্থান নয়। এগুলো নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করার আশা রইল।

[৩১] সূরা গাফের (৪০): ১৯

উপদেশ : ১

এক্ষুনি গুনাহ ছেড়ে দিন

হয়তো মুসলিম যুবসমাজ ও সকল মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর বস্তু হলো গুনাহের কাজে ডুবে থাকা। নিশ্চয়ই গুনাহ মানুষের জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গের চেয়েও ভয়াবহ। গুনাহ মানুষের অন্তরে এমন পর্দা ফেলে দেয়, যা তাদের ইতিবাচক মনোভাবকে দূর করে দেয়। ফলে গুনাহগার মানুষ উপদেশ শুনলেও আমল করে না। উপদেশবাণী পাঠ করলে উপদেশ গ্রহণ করে না। এমনকি কুরআন তেলাওয়াত করলেও বিনয়ী হয় না। চোখ থাকতেও যেন দেখতে পায় না।

এসবের একমাত্র কারণ হলো গুনাহের কাজে ডুবে থাকা। এটিই নিম্নোক্ত হাদীসের মূল ভাষ্য। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমদ রহ. বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

"إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتةٌ سوداء في قلبه. فإن تاب ونَزَع واستغفر صُقِل منها، وإن زاد زادت حتى يغلَّف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا، بل ران على قلوبهم". (رواه الترمذى وأبوداود)

"মুমিন যখন গুনাহে লিপ্ত হয়, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। যদি সে তওবা করে, বিরত থাকে এবং ইস্তেগফার পড়ে, তার অন্তর সাফ হয়ে যায়। আর যদি গুনাহ করতেই থাকে তাহলে সেই কালো দাগ বাড়তে থাকে। এটি সেই মরিচা, যার কথা কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– 'বরং তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের অন্তরে মরিচা পড়েছে।"

হে যুবসমাজ, নেককাজ করার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো গুনাহবর্জন করা। সুতরাং যে ব্যক্তি গুনাহ করে না এবং কুরআন তেলাওয়াত করে না, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যে কুরআন তেলাওয়াত করে, পাশাপাশি গুনাহ করে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

ما نهيتكم عنه فانتهوا ، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. (متفق عليه)

'আমি তোমাদের যা করতে বারণ করেছি তা থেকে বিরত থাকবে। আর যে কাজের নির্দেশ দিয়েছি, যথাসাধ্য তা বাস্তবায়ন করবে।'

যে ব্যক্তি মুসলিম জাতির সহযোগী হবে সে তো গুনাহ করতে পারে না। হযরত ওমর রা. তার সৈন্যবাহিনীকে অসিয়ত করতেন–

لاتعملوا بمعاصي الله وانتم في سبيل الله

'তোমরা আল্লাহর রাস্তায় থাকাকালে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ো না।'

আর সবচেয়ে ভয়াবহ হলো সেই গুনাহ, যা নিয়মিত করা হয়। ধারাবাহিক গুনাহ করে যাওয়া অন্তর নষ্ট হয়ে যাওয়ার আলামত। কাজেই দ্রুত অন্তরের চিকিৎসা গ্রহণ করুন। না হলে দিন যতই অতিবাহিত হবে, অবস্থা ততই শোচনীয় হবে। সামনের দিন হবে আরও খারাপ।

হে যুবক যুবতী ভাই ও বোনেরা, মনে রাখবেন, আপনার গুনাহ থেকে সরে আসা, ভবিষ্যতে গুনাহে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা এবং অতীতের কৃত গুনাহের জন্য লজ্জিত হওয়া আপনার জীবনে নতুন এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করবে। আল্লাহ তা'আলা আপনাদের যাবতীয় গুনাহ মোচন করবেন। তিনি স্বীয় বান্দার তওবা কবুল করেন। সকল গুনাহ মাফ করে দেন এবং যারা তার নৈকট্য লাভ করতে চায় তাদের কাছে টেনে নেন। তিনি অনেক বড়, মহিমাময়।

অতঃপর আজকের তওবা কালকের জন্য রেখে দেবেন না– এমনকি এই মুহূর্তের তওবা পরবর্তী মুহূর্তের জন্য রেখে দেবেন না। কারণ, আত্মা একবার বের হয়ে গেলে আর কখনো ফিরে আসবে না। আত্মা তো মাত্র একবারই বের হবে। আর মৃত্যু কোনো অবস্থাতেই সামান্য সময়ের জন্য বিলম্বিত হবে না। আল্লাহ তা'আলা তওবাকারীদের প্রশংসায় বলেন–

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. (النساء)

'তারা খুব জলদি তওবা করে।'[৩২]

অর্থাৎ গুনাহ হয়ে গেলে তারা তওবা করতে দেরিও করে না। ফলে তারা অবিরাম গুনাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

দুআয় বেশি বেশি তওবা ও ইস্তেগফার করবেন। যেন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে মাফ করে দেন। আপনার গুনাহ ও অন্যায়সমূহ গোপন রাখেন।

---

[32] সূরা নিসা (৪): ১৭

কারণ, আল্লাহ তা'আলা তওবা কবুলকারী। দুআ কবুলকারী। নিঃসন্দেহে তিনি আপনার দুআও কবুল করবেন। আর দুআ কবুলের নিদর্শন হলো, দেখবেন আপনার অন্তর নেক কাজের প্রতি উৎসাহিত হবে, নেক কাজ করতে আপনার ভালো লাগবে, কৃত গুনাহের কারণে ভয় অনুভূত হবে, কুরআন-হাদীসের আলোচনার সময় আপনার অন্তর বিগলিত হবে।

অন্তরে এমন অবস্থা অনুভূত হলে বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবেন। অন্তরকে সর্বদা জাগ্রত রেখে আমলে অগ্রগামী হবেন। যেন অন্তরের এই কোমলতা ও ইবাদতের স্বাদ স্থায়ী হয়।

আর আপনি যদি এমন অবস্থা অনুভব না করেন তাহলে খুঁজে দেখুন কোনো না-কোনো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুনাহ আপনি নিয়মিত করে যাচ্ছেন, যার খবরও আপনার নেই। কখনো কখনো গুনাহ হয় দৃষ্টির মাধ্যমে, কখনো গীবতের মাধ্যমে, কখনো অবৈধ গান-বাজনা শোনার মাধ্যমে, কখনো পিতা-মাতার অবাধ্যতায়, কখনো রাগের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনোভাবে, যা গুনাহ হওয়ার উপলব্ধি হয়তো আপনার অন্তরে নেই।

গুনাহে সগীরার ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। সগীরা গুনাহ ধীরে ধীরে অন্তরে প্রবেশ করে একপর্যায়ে পাহাড়ের আকার ধারণ করে। সগীরা গুনাহ বারবার করলে সেটাও কবীরায় রূপান্তরিত হয়। মনে রাখবেন, তওবা করলে যেমন কবীরা গুনাহ কবীরা থাকে না, অনুরূপ বার বার সগীরা গুনাহে লিপ্ত হলে সেটি আর সগীরা থাকে না– কবীরায় পরিণত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত হাদীসটি মনে রাখবেন। ইমাম আহমদ রহ. হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادٍ فجاء ذا بعودٍ وذا بعودٍ، حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. (رواه الإمام أحمد)

'তোমরা ছোট ছোট তুচ্ছ গুনাহ বর্জন করো। ছোট গুনাহ ওই সম্প্রদায়ের মতো, যারা কোনো উপত্যকায় আসার পর একজন একটা লাকড়ি নিয়ে এল, আরেকজন আরেকটা লাকড়ি নিয়ে এল। অবশেষে এই লাকড়ি দিয়েই তারা রুটি রান্না করে ফেলল। তোমরা ছোট ছোট গুনাহ বর্জন করে চলবে। কারণ, ছোট গুনাহ মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।'[৩৩]

[33] ইমাম আহমাদ

ছোট গুনাহ হলো, যেসব গুনাহ মানুষের দৃষ্টিতে ছোট। আর ছোট হওয়ার কারণে মানুষ তা থেকে খুব একটা সতর্কতা অবলম্বন করে না। একপর্যায়ে সেই ছোট গুনাহই বিরাট আকার ধারণ করে তাকে ধ্বংস করে ফেলে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের আপনাদের সকল মুসলমানদের নিরাপদে রাখুন। গুনাহ থেকে হেফাজতে রাখুন। আমীন।

উপদেশ : ২

দ্বীন-ইসলামকে বুঝুন

কীভাবে দ্বীন-ধর্মের সাথে আপনার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে, যদি ধর্ম সম্পর্কে আপনার জানাশোনা না থাকে? যেকোনো মাযহাব, যেকোনো আদর্শ তখনই আঁকড়ে ধরা সম্ভব, যদি আপনি সে সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করে থাকেন। এমন পথে আপনি চলবেন কীভাবে, যে পথ আপনার অজানা? অজানা পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছা বড় কষ্টের।

জীবনের কত মাস, কত বছর কেটে গেল অথচ দ্বীনের পর্যাপ্ত জ্ঞান আপনি অর্জন করলেন না! দ্বীন নিয়ে পড়াশোনা করার, দ্বীনের জ্ঞানার্জন করার সময় কি এখনো আসেনি?

দ্বীন-ইসলাম তথা ইসলামধর্ম এক মহান ধর্ম। সবদিক থেকে ইসলামধর্ম এক মহান ধর্ম। ইসলামধর্মের মহত্ত্বকে কেউ আয়ত্ত করতে পারবে না। এটি সুদৃঢ় দ্বীন, যা স্বয়ং আসমান-যমিনের প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীন সুদৃঢ় করেছেন। এই ধর্মকে তিনি নিজে অভিনব আকারে সৃষ্টি করেছেন। তাতে কোনো অপূর্ণতা রাখেননি; ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা এবং আল্লাহ তা'আলা এই ধর্মকে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেয়ামত সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا. (المائدة)

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।'[৩৪]

[৩৪] সূরা মায়েদা (০৫): ৩

কাজেই আল্লাহ মনোনীত এই পূর্ণাঙ্গ দ্বীন-ধর্মের মাধ্যমে দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণসাধনের জন্য পর্যাপ্ত-সময় ব্যয় ও একনিষ্ঠ-সাধনার কোনো বিকল্প নেই। তবেই আপনি কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভ করতে পারবেন।

অন্যদিকে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শেষ নেই। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওলামায়ে কেরামের নব আবিষ্কারের কোনো শেষ নেই। ফলে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরে অনুপ্রবেশের জন্য একজন যোগ্য লোকের নির্দেশনা দরকার, যিনি আপনার হাত ধরে ধীরে ধীরে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত শিখরে আরোহণ করাবেন। যাতে মাঝপথে হোঁচট না খান।

সুতরাং আজই কুরআন হাদীসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুদীর্ঘ পথের যাত্রা শুরু করুন। কুরআন-হাদীস হলো ইসলামের প্রধান দুটি স্তম্ভ। এরপর ধীরে ধীরে ইসলামের অন্যান্য জ্ঞানশাস্ত্রের পথে পা বাড়াবেন। ধাপে ধাপে। **বাড়াবাড়ি কাম্য নয়।** কারণ, ইসলাম সুসমৃদ্ধ ধর্ম। বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়ি আপনাকে বিপথগামী করতে পারে। তাই একজন যোগ্য আলেমে দ্বীনের সহযোগিতা ও পরিচালনায় ইলমে দ্বীনের পথে পা বাড়াতে হবে। তখনই আপনি আকীদা-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র, হাদীস-ফেকাহ, শরিয়া ইত্যাদি শাস্ত্রে ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধন করতে পারবেন– ইনশাআল্লাহ!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সীরাত ও জীবনচরিতশাস্ত্রে আপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন হলো কুরআনের সুস্পষ্ট বাস্তব ব্যাখ্যা। ছোট-বড় সকলের জন্য দ্বীনের যাবতীয় বিষয়ে তা অনুসরণীয়।

এরপর আপনাকে সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠে অধিক গুরুত্বারোপ করতে হবে। কারণ, তারাই দ্বীন-ইসলামকে আমাদের কাছে পৌঁছিয়েছেন। দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যাকে জীবনে বাস্তব প্রয়োগ করেছেন। তারা সেই সব মহামানব, আল্লাহ্‌ রব্বুল আলামীন যাদের স্বীয় নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচন করেছেন এবং ইসলামের বাণীকে পরবর্তী উম্মতের কাছে পৌঁছাবার মাধ্যম বানিয়েছেন।

এরপরের স্তর হবে ইসলামী ইতিহাস। কুরআন হাদীস সীরাত ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনী পাঠ শেষে ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে হবে। তবে অবশ্যই মিথ্যামিশ্রিত ও বিকৃত-ইতিহাস গ্রন্থপঞ্জি বর্জন করতে হবে। এ শাস্ত্র পাঠে সফলতা লাভের একমাত্র উপায় হলো, এ বিষয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতের সহযোগিতা গ্রহণ করা। কারণ, ইতিহাসশাস্ত্রের অধিকাংশ অধ্যায়ই বিকৃতি ও মিথ্যায় ভরপুর।

জীবনে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুসমাবেশ ঘটাতে হলে প্রচুর সময় ব্যয় করার কোনো বিকল্প নেই। কাজেই অর্থহীন বিনোদনের পেছনে অযথা নষ্ট করার সময় কোথায়? উদ্দেশ্যহীন রাস্তাঘাটে ঘোরা-ফেরা, চায়ের দোকানে সময় কাটানোর কোনো সুযোগ আছে?

সময় কাজে লাগালে প্রতিটি মুহূর্তে উপকারী ইলম অর্জন করা সম্ভব। সুতরাং ইলমের পথে সর্বোচ্চ সময় ব্যয়কল্পে আপনার পূর্ণ সামর্থ্য ব্যয় করুন। মনে রাখবেন, ইলমের পথ হলো জান্নাতের পথ।

ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. (رواه مسلم)

'যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তার জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।'[৩৫]

উপদেশ : ৩

মসজিদের সাথে সম্পর্ক গড়ুন

যুবসমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো মসজিদ। জামাতের সাথে নামায আদায়ের নির্দেশ কেবল অধিক নেকী অর্জনের জন্য নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা জামাতের সাথে নামাযের সওয়াব বাড়িয়ে দিয়েছেন মসজিদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য।

মসজিদ ব্যক্তি ও সমাজের ঈমান হেফাজতের কেন্দ্র। যে ব্যক্তি মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করল সে নিজের ঈমান ও তাকওয়ার হেফাজতের মাধ্যমকে সংরক্ষণ করল, এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন–

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. (التوبة)

'আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের ওপর ঈমান রাখে।'[৩৬]

---

[৩৫] মুসলিম : ২৬৯৯
[৩৬] সূরা তওবা (০৯): ১৮

বোঝা গেলো, নিয়মিত মসজিদে নামায আদায় করা এবং মসজিদ আবাদ করা আল্লাহ ও কেয়ামত দিবসের ওপর পূর্ণ ঈমান আনার আলামত। অতঃপর এই ব্যক্তি অন্যান্য ভাইদের ঈমানের পথে সহযোগিতা করবে।

যারা নিয়মিত মসজিদে নামায আদায় করেন, কোনো কারণে কোনো নামাযে মসজিদে উপস্থিত না হলে অন্য মুসল্লীগণ তার খোঁজখবর নেন। এভাবে তারা একে অপরের সহযোগী হয়ে ওঠেন। পরস্পরে ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হয়।

এরচেয়ে বড় ফায়দা হলো, মসজিদের নামাযে যে মনোযোগ ও ভাবগাম্ভির্য্য থাকে, ঘরের নামাযে তা থাকে না। নামায-সংক্রান্ত ফায়দা অনেক বেশি। এ ছাড়াও মসজিদের নামাযে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না।

পাশাপাশি আপনি যদি মসজিদের ইলমি মজলিসগুলোয় মিলিত হন– যদি পারেন, যেমন মসজিদে কুরআন হিফজ করার মজলিস হয়, অনেক সময় নামাযের পর সংক্ষিপ্ত তা'লীম হয়– এগুলো আপনার দ্বীনী মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সহযোগী হবে, মসজিদের সাথে আপনার সম্পর্ককে আরও বৃদ্ধি করবে। এ সবকিছু আপনাকে একজন সৎ-পূর্ণাঙ্গ মুমিন হিসেবে গড়ে তুলবে।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মসজিদের মুসল্লীদের প্রচুর সওয়াব দান করেন। অথচ ঘরের মুসল্লী যেই নামায আদায় করেন তারাও সেই নামায আদায় করেন। উভয়ের নামাযের নিয়ম-কানুন, আদায়পদ্ধতি একই রকম। পার্থক্য শুধু জামাত।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (متفق عليه)

"জামাতের নামায একাকী নামাযের চেয়ে সাতাশ গুণ অধিক উত্তম।"[৩৭]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا، كُلَّمَا غَدَا، أَوْ رَاحَ.
(متفق عليه)

---

[৩৭] মুসলিম : ৬৫০

'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মসজিদের দিকে যায়, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে মেহমান খানা তৈরী করেন, সকাল বিকাল সে যতবার যায় ততবার।'[৩৮]

উপদেশ : ৪

সবাইকে ছাড়িয়ে যান

অধিকাংশ যুবকের ধারণা হলো দ্বীনদার হওয়া, ইসলামকে আঁকড়ে ধরার অর্থ হলো, মসজিদে ই'তিকাফ করা, সর্বদা কুরআন তেলাওয়াত করা, নামায পড়া ও যিকির-আযকার করা। এই মনোভাবের ফলে তারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে। পড়াশোনাকে জীবনের নগণ্য কাজ মনে করে। কারণ, তারা মনে করে, জান্নাতের পথ হলো, শরয়ী ইলমের পথ। অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান জান্নাতের পথ নয়।

তাদের এই ধারণা স্পষ্টই ভুল ও ভ্রান্ত।

পড়ালেখায় অন্যদের ছাড়িয়ে যাওয়া ইসলামেরই বিষয়– ইসলাম ভিন্ন কোনো বিষয় নয়। ইসলাম এই পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। এটি ইসলামেরই একটি অঙ্গ।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আধুনিক-আবিষ্কারের দিক থেকে বিশ্ব এখন দুই ভাগে বিভক্ত–

এক. উন্নত বিশ্ব

দুই. অনুন্নত বিশ্ব।

যে জাতির সূচনা হয়েছিলো 'ইক্বরা'-এর মাধ্যমে, সে জাতি দুর্বল ও অনুন্নত জাতিতে পরিণত হবে– এ কথা মেনে নেওয়া যায় না।

এমন ছাত্রদের দেখে আমি খুব কষ্ট পাই, যারা নামায-কালাম, কুরআন তেলাওয়াত তথা ইবাদতমূলক কর্মকাণ্ডে এগিয়ে, কিন্তু শ্রেণিকক্ষে অমনোযোগী। পরীক্ষায় টেনেটুনে পাশ করলেও মাঝে মাঝে ফেল করে। বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন শেষে দেখা যায়, তার সহপাঠীরা বড় বড় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় আর সে সবার থেকে পিছিয়ে থাকে।

---

[৩৮] *মুসলিম* : ৬৫৯

এটা কি দ্বীনের শিক্ষা?!
এটা কি ইসলামের শিক্ষা?!
ইসলাম সম্পূর্ণ এর বিপরীত।

ইসলাম এমন এক ধর্ম, যা সর্বদা প্রত্যেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার আহ্বান করে। প্রত্যেক কাজে আস্থা অর্জন করতে বলে।

হে যুবক যুবতী ভাই ও বোনেরা, এই জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করলে, এ জাতির মর্যাদা উঁচু করতে চাইলে পড়ালেখায় পূর্ণ মনোযোগী হতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। যেন আপনাদের কল্যাণে জাতি এ কথা বলতে বাধ্য হয়, আমরা নিছক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও শিক্ষক চাই না। আমরা চাই আলেম-ডাক্তার, ধার্মিক-ইঞ্জিনিয়ার, আলেম-শিক্ষক ইত্যাদি।

মনে রাখবেন, যদি জ্ঞান-বিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি এ জাতির উন্নতি কামনা করেন, তবে তা নিঃসন্দেহে ইবাদত বলে গণ্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা মুসলিম যুবসমাজকে সর্বত্র শ্রেষ্ঠত্বের আসন দান করুন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বে পরিণত করুন। আমীন।

উপদেশ : ৫

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করুন

মুসলিমসমাজ আজ ভয়াবহ বিপদের মুখে দাঁড়িয়েছে। আজ তাদের পারস্পরিক বন্ধন, ভ্রাতৃত্ববোধ শূন্যে নেমে এসেছে। আজ সবাই নিজেকে নিয়ে মহাব্যস্ত। অন্যের দিকে ফিরে তাকানোরও সময় নেই।

মাসের পর মাস চলে যায়, বছরের পর বছর, ভাই ভাইকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে না। ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করে না। চাচা-ভাতিজাদের কোনো খোঁজখবর নেয় না। মামা-ভাগিনা খবর নেয় না। সবার মাঝে আজ এক অদৃশ্য দূরত্ব বিরাজ করছে। যেন সবাই সবার থেকে আলাদা।

মুসলিম উম্মাহর এই দূরত্ব তাদের জীবনে অসংখ্য বিপদ ডেকে আনবে!!
সমাজ-বিচ্ছিন্ন মানুষ জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করতে পারে না। ঘাত-প্রতিঘাত চাই সামাজিক হোক বা ব্যক্তিগত। বিপদে আপদে তো সর্বপ্রথম

রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়রাই এগিয়ে আসে। সুতরাং যদি অবস্থা এমন হয়, আত্মীয়দের সাথে পরস্পর কোনো সম্পর্ক নেই, কেউ কাউকে চেনেই না, তাহলে তো অন্যদের সাথে সম্পর্ক থাকবেই না। এটা খুবই স্বাভাবিক। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক না থাকলে দেখবেন, প্রতিবেশীর সাথেও সুসম্পর্ক নেই। দেখবেন, সহকর্মী সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, ধীরে ধীরে কাছের বন্ধুরা দূরে সরে যাচ্ছে। মুসলমান মুসলমানের কোনো খোঁজখবর নিচ্ছে না।

এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের সাথে নিজের সম্পর্ক রক্ষার ঘোষণা দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. [متفق عليه]

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করার পর যখন ফারেগ হলেন, তখন জরায়ু দাঁড়িয়ে বলে উঠল, সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে সুরক্ষা ও আশ্রয়প্রার্থীর জন্য এটা (উপযুক্ত) স্থান। তিনি (আল্লাহ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে যে সুসম্পর্ক রাখবে, আমিও তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব। আর যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। সে (জরায়ু) বলে উঠল, হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট! আল্লাহ বললেন, তাহলে এ মর্যাদা তোমাকে দেওয়া হলো। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার ইচ্ছে হলে এ আয়াতটি পড়ো– (অর্থ) শীঘ্রই যদি তোমরা কর্তৃত্ব লাভ করো, তাহলে কি তোমরা পৃথিবীতে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলবে? আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন বানিয়ে দেন।

তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে গভীর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে না? না কি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[৩৯]

যখন বড়রা দূরত্ব কমিয়ে ফেলবে, আত্মীয়তার সম্পর্ককে রক্ষা করবে, তখন যুবকশ্রেণি নতুন উদ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে। তখন প্রত্যেক যুবক বিচ্ছিন্ন সম্পর্কগুলোকে নতুনভাবে জোড়া লাগাবে এবং যে সকল সমস্যা সমাজে বিদ্যমান, তা যথাসাধ্য সংশোধন করার চেষ্টা করবে। এভাবে নতুন এক স্বর্গীয় সমাজ গড়ে উঠবে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববন্ধনের নতুন মাত্রা যোগ হবে।

যুবসমাজ সমীপে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন...

আপনি যতই বড় হন না কেন, পিতা-মাতার ওপর বড়ত্ব জাহির করা আপনার জন্য জায়েয নয়!!

এটি পিতা-মাতার ফজিলত উল্লেখ করার স্থান নয়। শুধু এতটুকু উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করছি, আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার আনুগত্যকে স্বীয় ইবাদতের পর উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তাদের বিরোধিতা না করা ও তাদের কষ্ট না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তারা কাফের হলেও তাদের কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি তারা আল্লাহর সাথে শিরক করার নির্দেশ দেন তখন তাদের আনুগত্য করা যাবে না। তবে তখনো তাদের সাথে সদাচরণ করতে হবে।

আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বলেন–

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. (لقمان)

'স্মরণ করো যখন লুকমান উপদেশ দিতে গিয়ে তার পুত্রকে বলেছিল, হে বৎস, আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক কোরো না। নিশ্চয় শিরক হলো চরম জুলুম।

আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে

[৩৯] সূরা মুহাম্মদ (৪৭): ২২-২৪; *বুখারী* : ৫৫৬১

এবং দুই বছরে তার দুধ ছাড়িয়েছে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমার নিকটেই। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার অংশীদার বানাতে যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পৃথিবীতে সদ্ভাবে তাদেরকে সঙ্গদিবে এবং যে ব্যক্তি বিশুদ্ধচিত্তে আমার অভিমুখী, তার পথ অবলম্বন করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব।'[৪০]

অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক হাদীসে জান্নাতে প্রবেশকে পিতা-মাতার সন্তুষ্টির সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ইমাম মুসলিম রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْف، قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. (رواه مسلم)

'ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় জর্জরিত হোক, ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় জর্জরিত হোক, ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় জর্জরিত হোক! সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, কার ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি তার বাবা-মার যে কোনো একজনকে অথবা উভয়জনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পাওয়ার পরও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারেনি।'[৪১]

উপদেশ : ৬

বন্ধু নির্বাচন করুন ভেবে-চিন্তে

আপনার ঈমান যতই উন্নত হোক না কেন, অসৎসঙ্গ আপনার ঈমানকে প্রাথমিক পর্যায় কিংবা আরও নিম্ন স্তরে নিয়ে যেতে পারে। এ কথা বলবেন না, আমি আমার ঈমান হেফাজত করব, কারও প্রভাবে আমি প্রভাবিত হব না।

---

[৪০] সূরা লুকমান (৩১): ১৩-১৫

কারণ, মানুষের আখলাক-চরিত্র, দ্বীন-ধর্ম, স্বভাব-চরিত্র সাথী-সঙ্গীদের অনুরূপ হয়ে থাকে।

এ বিষয়টি জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ ও আহমদ রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل. (رواه الترمذى وأبوداود)

'মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদেরকে দেখা হবে যে, তোমরা কাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছ?'

সুতরাং আপনি যদি জান্নাতের পথ অবলম্বন করতে চান, তাহলে সৎসঙ্গ অবলম্বন করুন। ইমাম আহমদ রহ. হযরত ইবনে ওমর রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. (رواه أحمد)

'যে ব্যক্তি জান্নাতের সুখ কামনা করে সে যেন জামাতের সঙ্গে থাকে।'[৪২]

এবং আপনি শয়তানের ওপর বিজয়ী হতে চাইলে একাকী তার সঙ্গে লড়াই করতে পারবেন না।

ইমাম আহমদ রহ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْفَذِّ، وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ. (رواه أحمد)

'কারণ নিশ্চয় শয়তান একাকী ব্যক্তির সঙ্গে থাকে। দু'জন থেকে দূরে থাকে।'

মোট কথা, যে ব্যক্তি উম্মতের কল্যাণের ইচ্ছা রাখে, তার জন্য আবশ্যক হলো সৎসঙ্গ অবলম্বন করা। সৎসঙ্গ আপনাকে প্রতিমুহূর্তে ভালো কাজের কথা মনে করিয়ে দেবে। নামায ছুটে গেলে স্মরণ করিয়ে দেবে। আপনি কুরআন পাঠের অজিফা ভুলে গেলে মনে করিয়ে দেবে। যখন আপনি ক্লাসের পাঠ বোঝার জন্য

---

[৪১] মুসলিম : ২৫৫১
[৪২] মুসনাদে আহমদ : ১৭৭

সহযোগিতা চাইবেন, তারা আপনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। বিপদে পড়লে তারা আপনাকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসবে। কারণ, তাদের আদর্শ আপনার মতোই । আপনার মতোই ইসলাম তাদের অনুসরণীয়। আপনার মতো তাদেরও স্বভাব-চরিত্র হলো কোমল, দয়াময়, সহনশীল। তাদের চিন্তা-ভাবনা গভীর। তাদের চরিত্র-মাধুর্য সুষম। তারা মুসলমানদের বিপদে এগিয়ে আসে। বুঝেশুনে আল্লাহর ইবাদত করে। তারা পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্যশীল। তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। ছোটদের স্নেহ করে। বড়দের সম্মান করে। কাজেকর্মে সবাইকে ছাড়িয়ে যায়– সৎসঙ্গীরা এরূপ গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে।

এমন লোকের সঙ্গ পেলে মানুষ রক্ষা পায়। সফলতা লাভ করে।

আপনি কি ভাবছেন, এরকম লোক স্বপ্নলোকেই বিদ্যমান, বাস্তবে এমন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না?!

আল্লাহর শপথ! আল্লাহর দুনিয়ায় এমন মানুষ সব সময়ই থাকে। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মাঝে কল্যাণ সব সময় থাকবে।

পক্ষান্তরে যে যুবক অসৎ-সাহচর্যে ডুবে থাকে, তার চোখের ওপর আবরণ পড়ে যায়। সে সবকিছুতে খারাপ দেখতে পায়। হ্যাঁ, যদি অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করে, তাহলে সে আবার কল্যাণ ও সফলতার পথ দেখতে পায়। সৎসঙ্গী গ্রহণকারী নিজেও মুক্তি পায় এবং তার আশপাশের সবাইও মুক্তি পায়। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের অন্তরকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করুন এবং তাদের এক কাতারবদ্ধ করুন। আমীন।

উপদেশ : ৭

যুগ সম্পর্কে সচেতন হন

কতিপয় দ্বীনদার যুবক দ্বীনী ইলম অর্জন করার পর সমুদ্রের মাঝে কোনো নির্জন দ্বীপে বসবাস শুরু করে। তারা মনে করলো, জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যুগ পরিবর্তনের এই সংগ্রামকে তাদের অসম্ভব মনে করার কারণ হচ্ছে, তারা যুগ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। বিশ্ব-প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিল যৎসামান্য। তাই বাস্তবমুখী জ্ঞানার্জন করুন।

বাস্তবমুখী জ্ঞান বলতে আমি মাদরাসা বা ভার্সিটির পরিবেশ-বিদ্যার কথা বলছি না। সেই রাষ্ট্র বা দেশের কথাও বলছি না, যে রাষ্ট্র বা দেশে আপনি বসবাস করছেন, বরং আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, গোটা মুসলিমবিশ্ব; তৎসঙ্গে পুরো বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা।

পৃথিবীর ইতিহাসে যত জাতির ভাগ্যে উত্থান-পতনের ইতিহাস রচিত হয়েছে, যত জাতির মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাদের ইতিহাস সবিস্তারে পাঠ করা পরিবর্তনকামী মানুষের জন্য অতীব জরুরি। জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে অতীতে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান দান করতেন। তিনি তাদেরকে তৎকালীন পৃথিবীর ঘটনাও বর্ণনা করে শুনাতেন। তিনি তাদেরকে খসরু, সিজার পারস্য, পারস্যের অন্যান্য শহর, রোম, রোমের দুর্গ, ইয়েমেন, আবিসিনিয়া, মিসর, বাহরাইন ইত্যাদি দেশের জ্ঞান দান করতেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের অবস্থান ও বিশ্ববাসীর অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারতেন এবং যুগের চাহিদা উপলব্ধি করতে পারতেন।

এ কারণেই যুগসচেতন বিচক্ষণ যুবকের উচিত, বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন করা। বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ম্যাগাজিন (রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি) অধ্যয়ন করা। চলমান বিশ্ব পরিবর্তনের মৌলিক কারণ নির্ণয় করা। এভাবে যুবসমাজ বাস্তব জীবনকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং বর্তমানে বিশ্ব-মানবতার দ্বীন-ধর্মের বাস্তব অবস্থাও অনুধাবন করতে পারবে।

এভাবেই যুবসমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে, যাদের কাঁধে ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ নির্মিত হবে।

উপদেশ : ৮

শরীরচর্চা করুন

শারীরিক সুঠাম গঠন, অবয়ব, শক্তি, বল, সুস্থতা যুবকদের অন্যতম গুণ। জাতির যেমন সুস্থ মস্তিষ্ক প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন পূর্ণাঙ্গ সুস্থ শরীর।

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, অর্থবহ শরীরচর্চার দিকে মনোযোগ দেওয়া। অর্থবহ শরীরচর্চা বলতে বোঝায়, ওই ব্যায়াম বা শরীরচর্চা, যা আপনার ও আপনার জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। যেমনঃ সাঁতার, তীরন্দাজি, আত্মরক্ষামূলক কলাকৌশল, শক্তিবর্ধক খেলাধুলা, ভারী বস্তু কাঁধে তোলা, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি শরীর, মস্তিষ্ক ও সমাজের জন্য উপকারী ব্যায়াম। হায়! আজ যুবসমাজ যদি বিভিন্ন খেলাধুলায় মাসের পর মাস নষ্ট না করে অর্থবহ ব্যায়ামের প্রতি মনোযোগী হতো!

যুবসমাজ সমীপে সবিনয় আবেদন, দয়া করে শরীরচর্চা বিষয়ক পড়াশোনায় বেশি সময় নষ্ট করবেন না। আজ যুবসমাজ শরীরচর্চা বিষয়ক বইপত্র পড়ে প্রচুর সময় নষ্ট করে থাকে। কিন্তু বাস্তব জীবনে তার কিয়দংশও প্রয়োগ করে না। আমরা পড়াশোনা করি কিন্তু আমল করি না। এটি আজ আমাদের জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শুধু আলোচিত বিষয়ে নয়, সব বিষয়েই!!

অন্যদিকে শারীরিক ব্যায়াম ও অনুশীলন যেখানে ভালো ফলাফল বয়ে আনার কথা সেখানে অনেকেই এর পেছনে পড়ে জীবন ধ্বংস করতে বসে। কেউ এর পেছনে অধিক সময় ব্যয় করতে শুরু করে। অত্যাধুনিক জিমগুলোর পেছনে পড়ে অনেকে জীবনের বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করে ফেলে। বডিবিল্ডারের আদলে পেশী বানানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের সুস্থ সবল রাখা, যা দেশ জাতির কল্যাণে কাজে আসবে। যে সকল ব্যায়াম ও শরীরচর্চা আমাদের কোনো উপকারে আসে না, সেগুলোর পেছনে পড়ে সময় নষ্ট করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়!!

মনে রাখবেন, শরীরচর্চা উন্নতির মাধ্যম বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য নয়। তাই এর পেছনে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। কারণ, এর চেয়েও আপনার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যেগুলোর পেছনে অনেক সময় ব্যয় করতে হয়, অনেক চিন্তা-ভাবনা, চেষ্টা-পরিশ্রম করতে হয়।

উপদেশ : ৯

অন্যকে দ্বীনের দাওয়াত দিন

যখন আপনি দ্বীনের স্বাদ উপলব্ধি করতে শুরু করবেন, দ্বীনের ওপর চলার আনন্দ পাবেন, আল্লাহর আনুগত্যের তৃপ্তি পাবেন, তখন নিজের মুসলিম ভাইদের ভুলে যাবেন না, যারা আপনার সাথী-সঙ্গী। সারাজীবন যাদের সাথে আপনার সময় কেটেছে। আজ হয়তো আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আপনি হেদায়েত পেয়েছেন, কিন্তু তারা পায়নি। তাই তাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসা, দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া এখন আপনার দায়িত্ব।

আপনার সাথী-সঙ্গী ও পরিচিতজনদের তালিকা তৈরি করুন।

মাদরাসা, স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি-জীবন থেকে শুরু করে কর্মজীবন পর্যন্ত আপনার সাথী-সঙ্গীদের তালিকা করুন। আপনার পাড়ার সাথীদের লিস্ট করুন। এ ছাড়াও জীবনে চলার পথে আপনার কতজনের সাথে পরিচয় হয়েছে– যেমন: বিভিন্ন সভা-সেমিনার, সফর, ইন্টারনেট-সূত্রে পরিচিত এমন বহু মানুষকে আপনি খুঁজে পাবেন যারা আজও দ্বীন-বিমুখ।

ক্রমান্বয়ে তাদের সবার কাছে গিয়ে আপনি যে কল্যাণের পথে রয়েছেন, সে পথের দাওয়াত দিন। তাদের সাথে উত্তম কথা বলুন। তাদেরকে ইসলামের শান্তির কথা বলুন। তাদের মোবাইলে খুদে বার্তা পাঠান। টেলিফোনে তাদের সাথে কুশল বিনিময় করুন। তাদের নিয়ে দ্বীনী মজলিসে যান। তাদের সাথে ইসলামী জীবনব্যবস্থার কথা আলোচনা করুন। তাদেরকে দ্বীনী বইপুস্তক উপহার দিন।

কিছু একটা করুন। কারণ, এ তো ভ্রাতৃত্বের দাবি। ইসলামের দাবি। তাদের কল্যাণে আপনাকেই এগিয়ে আসতে হবে।

তাদেরকে সুখী সমৃদ্ধশালী জীবনের পথে আসার আহ্বান করুন, যে পথে আপনি আছেন।

মনে রাখবেন, আপনার কথায় তারা সারাজীবন যত নেক আমল করবে এবং তাদের আহবানে যারা আমল করবে (এভাবে কেয়ামত পর্যন্ত যারা সঠিক পথে আসবে) তাদের সবার আমলের সমপরিমাণ প্রতিদান আপনার আমলনামায় জমা হবে। কারণ, এসব আপনারই মেহনতের ফল।

ইমাম আহমদ রহ. হযরত বুরাইদা রা. এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

الدال على الخير كفاعله. (رواه أحمد)

'সৎকাজের পথপদর্শক সৎকাজ কর্তার মতো।'

এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

(حم السجدة)

'ওই ব্যক্তির অপেক্ষা কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত?'[৪৩]

উপদেশ : ১০

সময় কাজে লাগান

'সময় কাজে লাগান' কথাটি বহুলপ্রচলিত ও সাদাসিধে হলেও খুবই গুরুত্ব বহন করে আর অধিকাংশ যুবকই এ ক্ষেত্রে অবহেলা করে। তারা মনে করে কিছুক্ষণ সময়, কিছু মুহূর্ত, দুই-একদিন সময় নষ্ট করলে কী এমন ক্ষতি হবে! মনে রাখবেন, এভাবেই একদিন আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে। এই ক্ষুদ্র সময়গুলোর সমষ্টিই হলো জীবন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সময়ের এক মহা দৌলত দান করেছেন। আপনি চাইলে সময়কে কাজে লাগিয়ে জীবনে অনেক কিছু অর্জন করতে পারেন।

সময়কে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগানোর জন্য সময়ের সুষমবণ্টন আবশ্যক। সময়ানুবর্তিতাকে জীবনের অন্যতম গুণ সাব্যস্ত করুন। প্রত্যেক কাজের জন্য পৃথক পৃথক সময় নির্ধারণ করুন। পড়াশোনা, পর্যালোচনা, বিনোদন, সংসার তথা সবকাজের জন্য পৃথক সময় নির্ধারণ করুন।

---

[৪৩] হা-মীম-সাজদা (৪১): ৩৩

প্রতিদিন আপনি কী অর্জন করতে চান, তা আপনাকে জানতে হবে। জীবনের একটা দিন অতিবাহিত হবে আর আপনার অর্জনের খাতায় কোনো কিছু সংযোজন হবে না– তা অসম্ভব। আগামীকাল আপনার কী কাজ, তা আজই নির্ধারণ করুন। এভাবে সারাটা জীবনের কাজ নির্ধারণ করে সে মোতাবেক সময়কে কাজে লাগান।

জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করুন। গুরুত্বের বিচারে কোনটি অগ্রগণ্য, তা বাছাই করুন। সময় ও কাজের তালিকা করুন এবং কোন সময়ে, কোন মাসে, কোন বছরে আপনি কী অর্জন করতে চান, কী কাজ করতে চান, তা নির্ধারণ করুন।

পাশাপাশি বিজ্ঞজনদের পরামর্শে চলুন। তারা আপনার সফলতার পথে প্রদীপ হিসাবে কাজ করবেন। কাউকে কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করবেন না। কারণ, অজ্ঞতার চিকিৎসা হলো জিজ্ঞাসা করা। অন্যদের গন্তব্যসীমার শেষ থেকে আপনি আপনার ভ্রমণ শুরু নির্ধারণ করুন।

আপনার ছক ও সময় ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী কাজ না হলে ভেঙে পড়বেন না। প্রত্যেক মানুষই কখনো সফল হয় আবার কখনো ব্যর্থ হয়। সফলতা ও ব্যর্থতা জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তবে ভেঙে পড়লে চলবে না। ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আবার নতুনভাবে শুরু করুন। আল্লাহ্ আপনাদের সাথে আছেন। তিনি কখনো কারও প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেন না।[৪৪]

একটু ভেবে দেখবেন! আপনার জীবনের মূলধন কিন্তু আপনার এই সময়। আপনার জীবনের যেমন ক্ষুদ্র সময়গুলো কেটে যাচ্ছে, নিঃসন্দেহে পুরোটা এভাবে কেটে যাবে। তাই আজই সতর্ক হোন। জীবনের যে মুহূর্ত আজ চলে যাচ্ছে, তা কেয়ামত পর্যন্ত আর কখনো ফিরে আসবে না।

আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। নিজেকে কোনো অবস্থাতেই অসহায় মনে করবেন না। মনে রাখবেন, আপনি যদি দয়াময়ের দরোজায় সাহায্যের জন্য হাত তোলেন, তিনি কখনোই আপনাকে রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দেবেন না; বরং তার রহমত ও কল্যাণের দরোজাসমূহ খুলে দেবেন। আপনাকে সফলতা ও শান্তির পথে পরিচালিত করবেন। আপনাকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।

---

৪৪ إن الله لايضيع أجر المحسنين

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. (العنكبوت)

'যারা আমার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করে আমি তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন।'[৪৫]

[৪৫] সূরা আনকাবুত (২৯): ৬৯

শেষ কথা

আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারি, প্রায় সব বৃদ্ধই যৌবনকালে এই উপদেশগুলো আমলের উদ্দেশ্যে শুনতে চাইতেন। কিন্তু আজ তাদের হাতে আর সময় নেই। আজ তাদের যৌবন শেষ। আজ আপনি এসব কথা শুনছেন। এখন আপনার শোনার ও আমল করার সময় আছে। তাই বলছি, ওই দিন আসার পূর্বেই আমল করুন, যেদিন আপনি পুরোনো দিন ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবেন, কিন্তু তা আর কোনোদিনও ফেরত আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এমন অনেক নেয়ামত দান করেছেন, যা অন্যদের দান করেননি। আপনাকে শারীরিক শক্তি দান করেছেন, প্রখর মেধা দিয়েছেন, দৃঢ়-সংকল্প গ্রহণের তৌফিক দিয়েছেন, কোমল অন্তর এবং সুস্থ-সুন্দর অবয়র ও শারীরিক সৌম্য দান করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যুগ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত করেছেন। যুগকে অধঃপতন থেকে উন্নয়নের সোপানে ফিরিয়ে আনা, খারাপ থেকে ভালো পথে নিয়ে আসা ও দুর্বল থেকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব আজ আপনার।

আপনাকে আল্লাহ তা'আলা উক্ত কাজের জন্য নির্বাচন করেছেন। সুতরাং আপনি সমাজ দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। সমাজকে আপনার আদর্শে প্রভাবিত করুন। পরিবেশ-সমাজ কোনো কিছুকে আপনার পথে প্রতিবন্ধক ভাববেন না।

আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সমাজ পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য নয়।

আল্লাহ গোটা বিশ্বকে আপনার আদর্শে আদর্শবান করার জন্য সৃষ্টি করেছেন; আপনার পথ থেকে অন্যদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য নয়।

আল্লাহ আপনাকে যমিনবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন, তাদের কল্যাণ সাধন এবং পৃথিবী আবাসযোগ্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন।

কাজেই আপনি এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে অর্থহীন বিনোদন ও গল্পগুজবে সময় নষ্ট করবেন না।

আপনি হবেন আলোর মিনার। আপনাকে দেখে পথভোলা মানুষ পথ খুঁজে পাবে। আপনি হবেন সেই সুরাইয়া তারকা, যাকে দেখে মাঝ-সমুদ্রের মাঝি দিক ফিরে পাবে। আপনি হবেন সেই মহামানব, যার দ্বারা অধঃপতিত সমাজ আবার

ঘুরে দাঁড়াবে। আপনার দ্বারা বিশ্বমানবতা দুনিয়া আখেরাতের সফলতা ফিরে পাবে।

যখন খুব অস্থিরতায় ভুগবেন, নিজেকে দুর্বল মনে হবে, সহায় সম্বলহীন মনে হবে, তখন মনে করবেন, আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনই আপনার জন্য যথেষ্ট।[৪৬] তিনি নিজ কুদরতে ও অন্য মুসলমানদের মাধ্যমে আপনাকে শক্তিশালী করবেন। আপনি শুধু আল্লাহর বিধানকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরুন এবং মুসলমানদের পাশে থাকুন।

আল্লাহর কাজ করুন। আর দৃষ্টি রাখুন জান্নাতের দিকে। আর আপনার সামনে পথ খুলে গেলে গভীর রজনীর অশ্রু বিসর্জনে আমি অধমকে ভুলবেন না। হয়তো আপনার ও আপনাদের দু'আয় আল্লাহ আমাকে রহম করবেন। জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের নেয়ামত দান করবেন।

এতক্ষণ যা বললাম, তা কখনো ভুলে যাবেন না। আমি আমার বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।

স মা প্ত

---

৪৬ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

মাকতাবাতুল হাসান হতে প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য বইয়ের নাম সমূহ

- স্পেনের কান্না
  মূল: মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, অনুবাদঃ কাজী মুহাম্মদ হানীফ
- মনীষীদের স্মৃতিকথা
  মূল : মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- গীবত ও পরনিন্দা
  মূলঃ মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- অনিবার্য মৃত্যুর ডাক
  মূলঃ শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- আপনার দু'আ কি কবুল হচ্ছে না
  মূলঃ শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- শ্বাশত ইমানের পরিচয়
  মূলঃ শায়খ যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- সনাতন হিন্দুধর্ম ও ইসলাম
  মূলঃ ওবায়েদুল্লাহ মালির কোটলায়ি, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- ফিকাহ সংকলন
  মূলঃ সাইয়্যেদ আবুল হাসান নদভী, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- সুবিচার নৈতিকতা ও ইহসান সম্পর্কে ইসলামের বিধান
  মূলঃ মুফতী মুহাম্মদ সালমান মানসুরপুরী, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- তাতারীদের ইতিহাস
  মূলঃ ডা. রাগেব সারজানী, অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুল আলীম
- নারী তুমি ভাগ্যবতী
  মূলঃ ডা. আয়েয আল কারনী, অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- আপনি কিভাবে একজন আদর্শ শিক্ষক হবেন
  মূলঃ হযরত মাওঃ ক্বারী সিদ্দীক আহমদ বান্দবী (রহ.)
- আদর্শ সন্তান প্রতিপালনে নানাজী আলী তানতাভী (রহ.)
  মূলঃ আবিদা আল মুআইয়াদ, অনুবাদঃ মাওলানা নাজীবুল্লাহ সিদ্দীকী
- আমি কেন হানাফী
  মূলঃ মাওলানা আমিন ছফদার, অনুবাদঃ হাবিবুল্লাহ মিসবাহ
- সবুজ পৃথিবী ও মুসলমানদের অবদান
  মূলঃ লুকমান নজী, অনুবাদঃ আহমদ হারুন
- আধাঁর মানবী (উপন্যাস) লেখকঃ মাহিন মাহমুদ
- শেষ চিঠি (উপন্যাস) লেখকঃ মাহিন মাহমুদ

- গল্পে আঁকা জীবন , লেখক: ইসমাইল রফিক
- এসো আল কোরআনের গল্প শুনি
  মূল: আহমদ বাহজাত, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- গল্প শুনি হাদিস শিখি
  মূল: সামাহ কামেল, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- সীরাতের ছায়াতলে
  মূল: আবদুত তাওয়াব ইউসুফ, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল ফারুক
- আল আসমাউল হুসনা মহান আল্লাহর ৯৯ টি নাম ও গল্প কথায় হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা
  মূল: সামীর হালবী, আহমদ তাম্মাম, সালামাহ মুহাম্মদ
  অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল ফারুক, আশেক মাহমুদ
- সোনামনিদের জন্য কিছু দোয়া কিছু আদব (৪ কালার)
  সংকলন: উমায়ের লৎফুর রহমান
- গল্পে আকা সীরাত, লেখক: মাওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
- শোনো হে যুবক মূল: ডা. রাগেব সারজানী, অনুবাদ: আব্দুল আলীম
- সৌভাগ্য আসলে কোথায় ?
  মূল: ড. আনাস আহমাদ কারযুন, অনুবাদ: আবদুস সাত্তার আইনী
- ড্রাইভিং সিটে দু'জন, লেখক: ইসমাইল রফিক
- গল্প শুনি বিসমিল্লাহ বলি , গল্প শুনি সুবহানাল্লাহ বলি
  মূল : আবদুত তাওয়াব ইউসুফ ,অনুবাদ: আহমদ হারুন
- আন্দালুসের ইতিহাস, মূল: ডা. রাগেব সারজানী
- আদর্শ মুসলিম
  মূল: ড. মুহাম্মদ আলী আল-হাশেমী, অনুবাদ : ইসমাইল রফিক
- মহীয়সীদের গল্প শোনো [মিসর থেকে প্রকাশিত 'কুনী' সিরিজ অবলম্বনে রচিত]
  অনুবাদ: আবদুল্লাহ আল ফারুক
- নবীগণের গল্প শোনো
  মূল: উসামা মুহাম্মাদ কুতুব , অনুবাদ: আশেক মাহমূদ
- 'মাআরিফুল কুরআনের গল্প ঘটনা'
  মূল: মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. অনুবাদ: মুফতী শাফি বিন নূর
- তালিবুল ইলম গঠনের আদর্শ রূপরেখা
  মূল: শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা, অনুবাদ: উমাইর লুৎফর রহমান
- সাহাবীদের অন্তর্দৃষ্টি
  মূল : শায়খ সালেহ আহমাদ আশ-শামী, সম্পাদনা: মুফতী ফারুকুয্যামান
- মুমিনের ব্যবসা, লেখক: ইসমাইল রফিক

ড. রাগিব সারজানি ছোট এ বইয়ের অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠায় মুসলিম যুব সমাজকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি যেন যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়ে একটি পথের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং একদল বিষণ্ন যুবককে বিনীত শাষণে নিয়ে গিয়েছেন নিজের একান্ত কক্ষে। আর পরম মমতায় শুনেছেন তাদের বিষণ্নতার কথা। তাদের সে বিবরণে তিনি সহমর্মী হননি; তাদের অধোগামীতা ও সে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা দেখে বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়েছেন।

এরপর তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন একজন নির্দয় বিশ্লেষকের ভূমিকায়। চলমান সময়কে কেটে ছিঁড়ে বর্তমান যুবসমাজের একটি ভয়াবহ বাস্তবতাকে তাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের সোনালি যুবকদের গল্প শুনিয়েছেন আর মৃদু তুমুল আঘাতে তাদেরকে লজ্জিত করেছেন। অনুশোচনাবোধ জাগ্রত করেছেন। গভীর পর্যবেক্ষক দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন অধোগামীতার কারণগুলো।

ISBN